বা লি শ

তারাপদ রায়

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

সূচিপত্র

বালিশ ১১
এর বেশি কিছু নহে অদ্য ১৩
শরীর ১৫
ভুল ধারণা ১৭
হে নূতন ১৯
আপ রুচি খানা ২১
সাজপোশাক ২৩
কাণ্ডজ্ঞান ২৫
শুভ নববর্ষ ২৭
দুর্ঘটনার আগে ২৯
দুর্ঘটনা ৩১
ধারদেনা ৩৩
দম্পতি ৩৫
বিজনের রক্তমাংস ৩৭
কফিন ৩৯
ডাক্তারবাবু ৪১
স্বাস্থ্য ৪৩
বিলিতি বিয়ার-পাব ৪৫
ভাগ্যফল ৪৭
ছবি ৪৯
পতন ও মূর্ছা ৫১
রাজনীতি ৫৩
চপলতা ৫৫
অবাস্তব ৫৭
বাগ্বিধি ৫৯
নরবানর ৬১
বক্তৃতা ৬৩
স্ত্রীরত্ন ৬৫
মশা ও লবণহ্রদ ৬৭
রোগী ও ডাক্তার ৬৯
ভুল সঙ্কেত ৭১
যদ্দৃষ্টং ৭৩
বয়েস বাড়ছে ৭৫
ধানাই-পানাই ৭৭
শিশু জিজ্ঞাসা ৭৯
দৃষ্টিবিভ্রম ৮৩
আমপাতা জোড়া-জোড়া ৮৫
বইমেলা ও পাগল ৮৭
বড়লোক ৮৯
আবার বড়লোক ৯১
ভ্রমণকাহিনী ৯৩
জল ৯৫
হাস্যকবি সম্মেলন ৯৭
বিবাহমঙ্গল ৯৯
বাজেট ও গঙ্গারাম ১০১
কাব্যগ্রন্থ ১০৩
মুড়ি-মিছরি ১০৫
ডায়েটিং ১০৭
বই, বইমেলা ও আমি ১০৯
বইমেলায় গঙ্গারাম ১১২
পাঁচ মিনিট ১২৩

বালিশ

আমাদের ছোট বয়েসে একটা কথার কথা ছিল, 'নালিশ করে কয়টা বালিশ পেলি?'

নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, বাদবিতণ্ডা হলে ছোটরা কেউ অভিভাবক বা শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে নালিশ করত এবং সে নালিশ যদি বিফলে যেত (প্রায়ই যেত), তা হলে নালিশকারীকে অন্যেরা বিদ্রূপ করত, 'কী রে নালিশ করে কয়টা বালিশ পেলি।'

বলা বাহুল্য, এখানে নালিশ শব্দটির সঙ্গে বালিশের সুমসৃণ মিলবশত এই আশ্চর্য বাক্যটির উৎপত্তি। এই শব্দটির কোনও প্রতীকী অর্থ খুঁজতে যাওয়া অনর্থক হবে।

তবে বালক বয়েসে, নালিশ করে বালিশ না পেলেও বালিশ আমাদের অপার আনন্দ দিয়েছে সে আনন্দ সুখস্বপ্ন কিংবা সুখনিদ্রার নয়। বালক বয়েসে কেই বা তার তোয়াক্কা করে। বালিশের দৌলতে আমরা পেয়েছি অনাবিল উত্তেজনার আনন্দ।

রাতে আমাদের ছোটদের খাওয়া হয়ে গেলে বড়রা যখন খেতে বসত আমরা শোয়ার ঘরে চলে আসতাম। আমার আর দাদার শোয়ার জায়গা ছিল দালানের মধ্যের ঘরে, ঠাকুমার খাটে। খাট নয়, সেটা ছিল কালো মেহগিনি কাঠের পালঙ্ক, বিশাল আয়তন, বিরাট বিছানা।

অল্প কিছুদিন আগেই আমাদের সেই চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়া ছোট শহরে বরিশালের বিখ্যাত নট্ট কোম্পানি এসে যাত্রা করে গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল 'কর্ণার্জুন' পালা।

সেই কর্ণার্জুনের ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ প্রতি রাতে পুনরভিনীত হত আমাদের বিছানায়। দাদা হত দুর্যোধন, আমি মোটাসোটা ছিলাম বলে আমি হতাম ভীম। কিন্তু এই খণ্ডপালায় প্রায় নিয়মিতই ভীম পরাজিত হত। মহাকাব্যের অনুশাসনের প্রতি দাদার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ছিল না।

ভিতরের বারান্দায় যেই ঠাকুমার পায়ের শব্দ শুনতাম, সকলের খাওয়াদাওয়া তদারক করে, কাজের লোকদের শুতে পাঠিয়ে তিনি যখন ফিরতেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে যে যার পাশবালিশ কোলে নিয়ে মাথার বালিশে চোখ বুজে শক্ত হয়ে শুয়ে পড়তাম। এবং আশ্চর্যভাবে ঠাকুমা বিছানায় ওঠার আগেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যেতাম।

এখনও যখন কোনও কোনও বিনিদ্র রজনীতে বালিশে মাথা দিয়ে অসহায় শুয়ে থাকি, নিদ্রাসুন্দরী দেবী আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করেন, আমি তাঁকে বলি, 'আজ তুমি আমার সঙ্গে চাতুরি করছ, সেই বালকদের সঙ্গে তুমি চাতুরি করার চেষ্টা তো করনি।'

একবার আমার আর দাদার লড়াই খুব বেশি জমে গিয়েছিল। দাদার পাশবালিশটা ফেটে যায়, বালিশের ওয়াড় উপচিয়ে শিমুল তুলো সারা বিছানায়, সারা ঘরে ছড়িয়ে

পড়ে।

ভীম-দুর্যোধন গদাযুদ্ধের সেই সমাপ্তি।

বালিশের ব্যাপারে আমার আরেকটা বাল্যস্মৃতি আছে। আমাদের শহরের পাশের একটা গ্রামে আমার বড় পিসিমার বিয়ে হয়েছিল। বড় পিসিমা সেখানে থাকতেন না, পিসেমশায় সদরে ওকালতি করতেন। পিসিমার সেই শ্বশুরবাড়িতে এক রাতে ডাকাতি হয়। খবর পেয়ে অন্য অনেকের সঙ্গে পরের দিন সকালবেলা আমি সে বাড়িতে যাই।

সেখানে গিয়ে দেখি পুরো বাড়ি তুলোয় তুলো ঘর। বাড়িতে যত বালিশ ছিল, কোলবালিশ, মাথার বালিশ সব ডাকাতেরা ফালা ফালা করে ছিঁড়েছে। দাদা বলেছিল, ডাকাতেরা সারারাত না শুয়ে, না ঘুমিয়ে কষ্ট করে ডাকাতি করে আর সাধারণ লোক বালিশ মাথায় দিয়ে আরাম করে ঘুমোয়। এই রাগে ডাকাতেরা বালিশ পেলেই ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে।

আসলে ব্যাপারটা হল সেকালে তো ব্যাঙ্কের ভল্ট, বাড়িতে স্টিলের আলমারি এসব ছিল না, লোকেরা অনেক সময় দামি গয়না, টাকা এসব বালিশের তুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখত। এ তথ্য ডাকাতদের জানা ছিল তাই তারা বালিশ ছিঁড়ত।

অবশেষে আমার নিজের বালিশের প্রসঙ্গে আসি। বছর পঁচিশ আগে আমি 'মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে' নামে কবিতায় লিখেছিলাম, 'বালিশ তেমন নরম নয়, বালিশ তেমন শক্ত নয়।' এখনও অনুরূপ বালিশই আমার পছন্দ। তবে দুটো মাথার বালিশ চাই। আর একটা পাশবালিশ (কোলবালিশ)।

অনেকে অবশ্য এতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁদের কানবালিশ চাই, নাকবালিশ চাই, এমনকী গোড়ালি-বালিশ চাই।

অথচ বড় বড় হোটেল, সরকারি ডাকবাংলোয় বালিশ নিয়ে কী কৃপণতা! বিছানা প্রতি একটা মাথার বালিশ, তার বেশি কিছুতেই নয়, কোলবালিশ তো নয়ই।

কলকাতা বিমানবন্দরে একটা গেস্ট হাউসের সুন্দর বিজ্ঞাপন দেখাত, এখনও আছে কিনা, জানি না, সেখানে বলা ছিল এই অতিথিশালায় কোলবালিশের বন্দোবস্ত আছে।

তবু হোটেল বা বাংলোর বালিশ না, পৃথিবীর নরমঙ্গল উপাধান নয়, সবার চেয়ে আপন আমার বালিশ। তার তুলোর আঁশে আঁশে জড়ানো রয়েছে আমার অনেক সুখস্বপ্ন, অনেক জ্যোৎস্নাময় রাত, তারাভরা আকাশ, শেষরাতে হঠাৎ বৃষ্টির ছাট আর বহু বিনিদ্র রজনীর দুঃখ আর অভিমান ভরা স্মৃতি। সে আমার সব জানে, এই পড়ন্ত বয়েসে শুধু তার কাছেই আমার কোনও লজ্জা নেই।

এর বেশি কিছু নহে অদ্য

রবীন্দ্রনাথের রসবোধ ছিল অতি উচ্চমানের। শুধু 'খাপছাড়া' বা 'ব্যঙ্গকৌতুক' নয় কিংবা ওই জাতীয় আপাত-হালকা রচনা নয়, তাঁর রচিত বিপুল পদ্য ও কাব্য সাহিত্যের পরতে পরতে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে অমল কৌতুক-কণা।

রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত স্বীকারোক্তি,

'কোনোদিন-ও এত বুড়ো
হব না তো আমি,
হাসিতামাশারে যবে
কবো ছ্যাবলামি।'

সত্যিই রবীন্দ্রনাথ কোনওদিনই অত বুড়ো হননি।

তখন তিনি অস্তাচলে। প্রায় শেষ শয্যায়। একদিন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে বললেন, 'এসব কিছু নয়। আমরা আপনার শতবার্ষিকী করব।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'শতবার্ষিকী মানে তো মাত্র পঁচিশ টাকা। ও আমার কোনও মোহ নেই।'

কিন্তু শতবার্ষিকী মানে পঁচিশ টাকা কেন? শিবরাম চক্রবর্তীর স্টাইলে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'শতবার্ষিকী মানে শতবার সিকি মানে পঁচিশ টাকা, তাইতো?'

রবীন্দ্রনাথের লিখিত তথা মৌখিক রসিকতাগুলি বহুদিন ধরে সুবিদিত। সম্প্রতি 'বাক্যায়ন' নামে বাংলা ক্রশওয়ার্ড পাজলের একটি পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উৎপল সান্যাল কবির বেশ কয়েকটি অপ্রচলিত মৌলিক রসিকতার সন্ধান দিয়েছেন।

তখন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি শিলাইদহ গেছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা আনতে। রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন পদ্মার ওপরে বজরায়। নদীর ঘাট থেকে একটি এক তক্তার সাঁকো বজরা অবধি পেতে দেওয়া আছে।

পা টিপে টিপে সেই তক্তা ধরে চারুচন্দ্র নৌকোয় উঠে আসছেন, বজরার ছাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ সাবধান করলেন, 'চারু, সাবধানে পা ফেলো। এ জোড়াসাঁকো নয়।'

আরেকটি কাহিনী।

এক সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত রয়েছেন।

সেই সভায় ষনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। বলাইচাঁদ একটি অসম্ভব ভাল বক্তৃতা দিলেন।

সবাই সেই বক্তৃতার খুব প্রশংসা করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বলাই তো ভাল বক্তৃতা করবেই। বলাই তো ওর কাজ।'

অটোগ্রাফ শিকারিদের কাছে পরম লোভনীয় এবং আকর্ষণীয় ছিল রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের স্বাক্ষর।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্যকণিকা রয়েছে এই সব অটোগ্রাফের সঙ্গে, পরবর্তীকালে যেগুলো 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে অটোগ্রাফ দিয়ে যেতে হয়েছে।

তখন কবি খুবই অসুস্থ। শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে শান্তিনিকেতনের একটি ছোট মেয়ে তাঁর কাছে অটোগ্রাফ নিতে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ তার খাতায় শুধু সই করে দিলেন। সে মেয়ে ছাড়বে কেন? সে কেঁদে-কেটে বায়না ধরল তার অটোগ্রাফ খাতাতে কবিতা লিখে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তখন সেই অটোগ্রাফ খাতায় তাঁর সইয়ের পাশে লিখলেন,

'মোর কাছে চাহ তুমি পদ্য
চাহিলেই মিলে তা কি সদ্য
তাই আজ লিখিলাম
শুধুই নিজের নাম
এর বেশি কিছু নহে অদ্য।'

পুনশ্চ:

আর, রবীন্দ্রনাথ শুধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিল যে কোনও নীরস বিষয়কে সরস করা। ছন্দ-ব্যাকরণের আলোচনায় উদাহরণ দিতে গিয়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই উপহার দিতে পারেন:

'পাতলা করে কাটো সখি
কাতলা মাছটিরে।'

শরীর

বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। সেই কাহিনীর নায়িকার উদ্দেশে উপন্যাসের শেষ পংক্তি, শেষ সংলাপ, 'তোমার মন নাই কুসুম', বাঙালি পাঠকের মনের মধ্যে গত পঞ্চাশ বছর আকুলিবিকুলি করছে।

সত্যিই কুসুম শরীরসর্বস্বা ছিল কিনা, সে কী হৃদয়হীনা ছিল, তার মন ছিল না—এসব সূক্ষ্ম প্রশ্ন নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, সমালোচক তথা সার্জন সাহেবেরা বহু কাটাকুটি করেছেন।

আমরা অত জটিলতায় যাব না। তবে শরীর নিয়ে চলতি কথায় যা বোঝায়, স্বাস্থ্য, শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি, বাঙালি এসব নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামায়। দুই পরিচিতের মধ্যে দেখা হলেই প্রথম প্রশ্ন, 'কি দাদা শরীর ভাল তো?' তেমন তেমন লোককে প্রশ্ন করলে বিপদ হতে পারে, অন্তত আধঘণ্টা নিতে পারেন তিনি সদুত্তর দিতে।

গৃহিণীর আধকপালে, নিজের চোয়া ঢেকুর, ছোটখুকির সর্দিজ্বর। খাঁটি ওষুধ এবং ভাল ডাক্তারের অভাব। বাজারে সবই ভেজাল। তদুপরি সিজন চেঞ্জের সময়। ইচ্ছে করলে যে কেউ 'কেমন আছেন' প্রশ্নটাকে আধঘণ্টা আটকিয়ে দিতে পারেন। আর এসব দুঃখের কথা বলার সময় চলে যাওয়া যায় না।

বস্তুত এই কলকাতা শহরে আমাদের বন্ধু কবি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় থাকেন। তাঁকে যদি কেউ ভুল করেও প্রশ্ন করেন, 'কেমন আছেন?' তবে বিপদ।

সন্দীপনবাবু জামার কলার একটু তুলে দিয়ে প্রশ্নকারীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলবেন, 'সত্যিই জানতে চান?'

এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হওয়াই স্বাভাবিক। হ্যাঁ না হলেও আসে যায় না। সন্দীপনবাবু বলবেন, 'আপনার হাতে ঘণ্টাখানেক সময় হবে? কেমন আছি সেটা আপনাকে ভেবে বলতে হবে।'

সন্দীপনবাবু ভাল থাকুন, ততক্ষণে আমরা 'কেমন আছেন' ব্যাপারটা একটু যাচাই করে দেখি।

প্রবীণ মুসলমানদের দেখেছি, তাঁরা পরস্পর দেখা হলে সৌজন্য বিনিময় করেন। একজন বলেন, 'সালাম আলেকুম', অন্যজন 'আলেকুম সালাম'। একই কথা, একে অন্যের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা। কদাচিৎ পরস্পরের তবিয়ত বা শরীরের কথা ওঠে।

'গুড মর্নিং', 'গুড ইভিনিং' বাদ দিলে মুখোমুখি দেখা হলে সাহেবেরা বড়জোর আবহাওয়া, জলবৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন।

হিন্দি বলয়ে অবশ্য 'হাল ক্যায়সা' রীতি আছে। এই হাল বা অবস্থা, শুধু শারীরিক প্রশ্ন

নয়। সামাজিক, সাংসারিক, রাজনৈতিক সব কিছুর হাল সম্পর্কে লঘু জিজ্ঞাসা। এসব সূত্রে অবশ্যই শরীরের ভালমন্দের কথাও কখনও আসে।

এতদূর যখন এসে গেছি, পিছিয়ে গিয়ে শরীর সম্পর্কে তিনটি আপ্তবাক্যের স্মরণ করা যেতে পারে।

একটি তুলনাহীন, খাঁটি বাংলায়। 'শরীরের নাম মহাশয়। যা সহাবে তাই সয়।' এই কথার কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

বাকি দুটি সরল সংস্কৃত।

প্রথমটি সকলেরই জানা, 'শরীরম্ আদ্যং'। শরীর স্বাস্থ্য প্রথমে। বাকি যা কিছু খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-বান্ধব সবই গৌণ। শরীর ভাল না থাকলে এই সবই অর্থহীন।

দ্বিতীয় সংস্কৃত আপ্তবাক্যটি হল, 'শরীরম্ ব্যাধি মন্দিরম্'। সাদা বাংলায় বলা যায় শরীর হল অসুখের মন্দির, রোগের বাসা।

শরীর নিয়ে বেশ কিছুটা জ্ঞানবুদ্ধির চর্চার পরে এবার গল্প। সেটাই আসল।

মেডিকেল কলেজের শারীরবিদ্যার ছাত্রী লাইব্রেরিতে গেছে অ্যানাটমির বইয়ের খোঁজে।

শ্রীমতি যে বইটা পেয়েছে সেটা দশ বছর আগের সংস্করণ। প্রবীণ লাইব্রেরিয়ানকে সে কথা জানাতে তিনি বললেন, 'দিদিমনি, আপনাকে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, মানুষের শরীরের হাড় মাংস শিরা পেশি ছাড়া কিছুরই কোনও পরিবর্তন হয়নি। পুরনো বইয়ে যা আছে, নতুন বইয়েও তাই থাকবে।'

ভুল ধারণা

মানুষের যে কত রকম ভুল ধারণা থাকে, ভুল ধারণা হয়।

কলকাতায় পড়তে এসে প্রথম দুমাস আমার চুল কাটা হয়নি। 'হেয়ার ড্রেসিং সেলুন' নামধারী বিপণির সামনে গিয়ে থমকিয়ে পড়েছি, হেয়ার ড্রেসিং কী ব্যাপার, এখানে কি চুল কাটা, হেয়ার কাটিংও হয়?

কিশোর বয়সোচিত মফস্বলী সংকোচবশত কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। এ রকম চললে শেষ পর্যন্ত হয়তো বাবরি চুল রাখতে হত। কিন্তু একদিন সেলুনের বাইরে ফুটপাতের একপাশে এক ঝুড়ি কাটা চুল দেখে মনে বল পেলাম, এক ধাক্কায় সেলুনের দরজা খুলে ঢুকে গেলাম। ঢুকে আশ্বস্ত হলাম, সারি সারি চেয়ারে লোকেরা চুল কাটছে।

এটা ঠিক ভুল ধারণা নয়, ধারণার অভাবের ব্যাপার।

মানুষের সবচেয়ে বেশি ভুল ধারণা থাকে নিজের সম্পর্কে।

একবার সভাঘর থেকে একটি সংগীত অনুষ্ঠানে সুমন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গান শুনে হেঁটে আসছিলাম।

বছর পনেরো আগের কথা । সুমনবাবুর সেটা সুবর্ণ যুগ, যখন জাকির হোসেনকে দিয়ে তিনি পায়রা পুষিয়েছিলেন।

দু-চারজন ছিরকুটে লোক ছাড়া শ্রোতারা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ, আমি তো আপ্লুত।

আমার পাশে দুটি যুবক হাঁটছিল, তারাও গান শুনেছে। কথাবার্তা শুনে বুঝলাম তাদের মধ্যে একজন খুবই অভিভূত। দ্বিতীয়জন তেমন নয়। শুনলাম, প্রথমজন বলছে, 'আহা কী অসাধারণ! কী অসাধারণ কণ্ঠ! এমন গান শোনা যায় না, ভাব-ভাষা-কথা-সুর।'

দ্বিতীয়জন একটু নিরাসক্ত গলায় বলল, 'ওই রকম গলা পেলে আমিও ওই রকম গাইতে পারতাম।'

শাস্ত্রে আছে 'আত্মানাং বিদ্ধি', নিজেকে জানো। অনেকেই জানে না নিজেকে। এক পোরট্রেট শিল্পী বলেছিলেন, 'আমি তো খুব নিখুঁত করে যত্ন নিয়ে গ্রাহকদের ছবি আঁকি। কিন্তু গ্রাহকেরা সেই ছবি দেখে খেপে যান, এই মারেন কী সেই মারেন। তাঁরা তো ভাবতেই পারেন না যে তাঁরা দেখতে অত খারাপ।'

পরস্পরকে ভুল ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তাঁরা যদি অপরিচিত হন। তবে নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণার চেয়েও তা বিপজ্জনক।

দূরগামী রেলগাড়ির কামরায় দুই ব্যক্তি জানলার ধারে পরস্পরের বিপরীতে মুখোমুখি বসেছিলেন। অল্প বিস্তর, টুকটাক কথাবার্তার পরে প্রথম ব্যক্তি, গদাইবাবু, তাঁর হাতব্যাগ থেকে একটা বিশাল চুরুটের বাক্স বার করলেন। তারপর সেটা খুলে দুটো বড় চুরুট বার করে তাঁর যাত্রাসঙ্গী মাধাইবাবুকে একটা অফার করলেন, 'চলবে নাকি? খুব ভাল বার্মা চুরুট, আজকাল সহজলভ্য নয়।'

মাধাইবাবু নীরবে ঘাড় নেড়ে চুরুট গ্রহণে তাঁর অক্ষমতা জানালেন।

গদাইবাবু এটাই আশা করেছিলেন, এত ভাল জিনিস কাউকে বিলিয়ে দিতে প্রাণ চায় না। বিশেষ করে অপরিচিত কাউকে এমন উপহার না দিলেও চলে।

খুশি মনে গদাইবাবু একটি চুরুট বাক্সে রেখে দিলেন। তারপর দ্বিতীয়টি চুরুটের কাঠের বাক্সের উপরে ঠুকতে ঠুকতে মাধাইবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু খটকা লাগল তাঁর। সহযাত্রীর মুখে ভ্রুকুটি, তিনি চোয়াল শক্ত করে চুরুট ঠোকা লক্ষ করছেন।

একটু ইতস্তত করে গদাইবাবু চুরুট ঠোকা থামিয়ে মাধাইবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'আমি যদি চুরুট ধরাই, আপনি আপত্তি করবেন না।'

'না, না, আপত্তি কীসের?' শুষ্ক কণ্ঠে মাধাইবাবু বললেন, 'তবে তারপরে আমি যা করব, তাতেও যেন আপনি আপত্তি করবেন না।'

একটু বিচলিত হয়ে গদাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীসের আপত্তি?'

মাধাইবাবু বললেন, 'আপনি চুরুট ধরানো মাত্র আপনার হাত থেকে চুরুটটা কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেব। তখন যেন চেঁচামেচি, আপত্তি এসব করবেন না।'

হে নূতন

আমাদের প্রথম যৌবনে আমাদের নয়নের মণি, আমাদের হৃদস্পন্দন ছিলেন নূতন, শ্রীযুক্তা নূতন সমর্থ।

আমরা যে নূতনকে চিনতাম, যিনি ছিলেন হার্টথ্রব তিনি শোভনা সমর্থের মতো অভিনেত্রীর কন্যা! পরবর্তী প্রজন্মের তনুজা এবং বর্তমানের কাজলাদিদি সবাই একই সংসারের।

কিশোরকুমারের সঙ্গে নূতন ঠাকুরানির সেই ছবি, 'দিল্লিকা ঠগ', সেই অসামান্য গান 'সি-এ-টি ক্যাট মানে বিল্লি, আর-এ-টি র‍্যাট মানে চুয়া'...আজ এই পড়ন্ত বয়েসেও মনে পড়লে মনের মধ্যে দোলা দেয়।

না। এ নূতন সে নূতন নয়। আমাদের সেই যৌবন স্বপ্নকে হাসাহাসির কলমে টেনে আনব না। এবারের বিষয় নূতন বা নতুন, যাকে বলে new (নিউ)।

প্রসঙ্গত জানাই ইংরেজিতে সংবাদ হল news, সাংবাদিকরা এই হালকা রসিকতাটি জানেন যে news হল new-এর বহুবচন (plural)। খবর যদি নতুন না হয়, তাতে যদি নতুনত্ব না থাকে তা হলে সে খবর নিউজ হচ্ছে না। নিউজ হতে গেলে নতুন হতে হবে। পুরনো খবর সংবাদ নয়।

নূতন প্রসঙ্গে সাংবাদিকতার পাঠ এসে গেল। এত সব হাবিজাবি বলছি একটা দুঃখে। জব্দ হওয়ার মতো দুঃখ আর কিছু নেই। সম্প্রতি নতুনত্বের এবং সেই সঙ্গে লাভের মোহে আমি কিঞ্চিৎ জব্দ হয়েছি।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দমকল অফিসের উলটো ফুটপাতে পাশাপাশি অনেকগুলো পুরনো ইংরেজি বইয়ের দোকান। পুরনো পেপারব্যাকের এত ভাল স্টক কলকাতায় আর কোথাও নেই। অন্যান্য শহরেও বোধহয় নেই।

এই দোকানগুলোতে আমার বহুকালের যাতায়াত, দোকানদারেরা অনেকে আমাকে চেনেন, ফলে চেনা মানুষ বলে দোকানদারির রীতি অনুযায়ী আমাকে তাঁরা একটু বেশি ঠকাতে চেষ্টা করেন।

তা, সেদিন সেখানে একটা বই দেখলাম, 'দ্য নিউ জোকস' (The New Jokes)। বই হাতে তুলে দেখি নতুন দাম লেখা রয়েছে চার ডলার নিরানব্বুই সেন্ট। আমাদের হিসেবে প্রায় আড়াইশো টাকা।

বইটি আমার প্রয়োজন। নতুন রসিকতার জন্যে জগৎসংসারে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি মায়ের খোঁজে বাছুরের মতো।

দাম জিজ্ঞাসা করতে দোকানি বইটা একটু উলটেপালটে দেখে দাম বললেন, 'একশো টাকা'। আমি আশঙ্কা করেছিলাম অন্তত দুশো টাকা বলবে।

সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিতাম, কিন্তু একটু দাম-দর না করলে সন্দেহ করবে তাই 'সত্তর

টাকা' বললাম। একটু নামা ওঠার পরে অবশেষে পঁচাশি টাকায় বইটি কিনে হৃষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরলাম।

বাড়ি ফিরে বই পড়ে দেখে হতাশ হলাম। বোগাস। নিউ জোকস নামেই যা, নতুন জোক একেবারেই প্রায় নেই। পুরনো জোক যা আছে সেগুলো সবই প্রায় মোটা দাগের।

কিন্তু পঁচাশি টাকা খরচ করেছি। আমি ছাড়ার পাত্র নই। আমার প্রিয়পাত্র গঙ্গারামকে বইটা উপহার দিয়ে বললাম 'এই বইটা তোমার, যদি এর থেকে অন্তত দশটা পাঠযোগ্য রসিকতা খুঁজে বার করতে পার।'

গঙ্গারামচয়ন থেকে সাতটি রসিকতা পাতে দেওয়ার মতো। তার মধ্যে ছোট দুটি:

(এক)

বড় রাস্তার মোড়ে একটি পুরনো টাইপ-রাইটিং-এর দোকান। পুরনো সাইনবোর্ডে লেখা আছে, 'এখানে হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় টাইপ করা হয়।' সম্প্রতি এর পাশেই একটি জেরক্সের দোকান হয়েছে। তার নতুন সাইনবোর্ড, 'পৃথিবীর যে কোনও ভাষায় কপি করা হয়।'

(দুই)

নিত্য নির্যাতিত সরকারি চিকিৎসক তাঁর কিশোর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বড় হয়ে কী হতে চাও তুমি?'

ছেলে বলল, 'আমি ডাক্তারের ছেলে ডাক্তারই হতে চাই। তবে তোমার মতো মানুষের ডাক্তার নয় পশুর ডাক্তার হব।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'পশুর ডাক্তার? কিন্তু কেন?'

ছেলে বলল, 'পশুরা চিকিৎসার গোলমাল হলে অভিযোগ করতে পারে না। নিরাপদে চিকিৎসা করা যায়।'

আপ রুচি খানা

আপ রুচি খানা।

নিজের রুচি মতো খাবে।

আর পরের রুচিমতো পরবে, অর্থাৎ জামাকাপড় পরিধান করবে।

এই হল আপ্তবাক্য। কিন্তু আপ্তবাক্য তো সদা সর্বদা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। নিজের রুচিমতো, ইচ্ছেমতো সব সময় কি সব জিনিস খাওয়া হয়?

আমরা তো সন্দেশ, রসগোল্লা, দই-মিষ্টি খেতে ভালবাসি। কিন্তু তা খাওয়া হয় না, ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন। বিয়েবাড়িতে পাশের লোকেরা যখন বিরিয়ানি, ফ্রাই, কাটলেট ইত্যাদি প্রাণপণ খাচ্ছেন, আপনি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, আপনার প্লেটে তখন সাদা ভাত, শুক্তো, পনিরের ঝোল। এসবই চিকিৎসক মহোদয়ের নির্দেশ। আপনি ব্যতিক্রমী হতে চাইলেও পারবেন না, কারণ, সবাই জানে আপনার রক্তে চিনি এবং শ্যাওলা খুব বেশি। আপনি বিরিয়ানি, ফ্রাই ইত্যাদি খেতে চাইলে গৃহকর্তাই বাধা দেবেন।

এ তো গেল ক্ষুন্নিবৃত্তির কথা। খাওয়ার কথাও ভাবা যেতে পারে।

আমরা কি সব কিছু স্বেচ্ছায় খাই? তা তো নয়। আমরা মুখ কুঁচকিয়ে, চোখ বুজে কবিরাজ মশাইয়ের দেয়া নিমপাতার পাঁচন পাথরের গেলাসে করে খাই। আমরা বন্ধুর অনুরোধে, তাকে সঙ্গ দিতে গরমের দিনের দুপুরে ঘামতে ঘামতে বিস্বাদ তেতো বিয়ার খাই। আমরা শ্যালিকা ঠাকুরানিকে কিংবা প্রিয় বান্ধবীকে খুশি করার জন্যে তাঁর আবিষ্কৃত, তাঁর নির্মিত আদা-কাঁচকলার সাহী কাবাব (প্রিয় বান্ধবী জনৈকা শ্রীমতি সাহা, সাহা থেকে সাহী) যতটা সম্ভব মুখ অবিকৃত করে খাওয়ার চেষ্টা করি।

নিজে রান্না করে খেলে অবশ্য নিজের রুচিমতো কিছুটা খাওয়াদাওয়া করা যায়। কিন্তু সেটা কখনও চেষ্টা করে দেখেছেন?

হাত পুড়ে গেছে, মুখে আগুনের ঝলক কিংবা তেলকালি লেগেছে, জামায় ঝোল, হাতে হলুদ—রান্না করতে গিয়ে এমন হতেই পারে। কিন্তু নির্বিবাদে আপনার পছন্দমতো রান্না করতে পেরেছেন কি?

গাড়িতে যেমন ব্যাকসিট ড্রাইভিং আছে, স্বামী গাড়ি চালান আর স্ত্রী গাড়ির পিছনের সিটে বসে ক্রমাগত নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। 'আস্তে', 'এইবার খুব স্পিডে' 'সামনের গোরুর গাড়িটা বাঁদিকে কাটাও', 'ধুৎ, তুমি একেবারে যাচ্ছেতাই', 'হ্যাঁ হ্যাঁ আরও বাঁয়ে, আরও বাঁয়ে', 'আরে সাবধান, এ যে একেবারে নর্দমার মধ্যে'।

রান্নাঘরেও ঠিক তাই। ঠিক পিছনেই গৃহিণী। 'আর কয়েকটা লঙ্কা, না না আস্ত নয় ভেঙে দাও', 'জিরের কৌটো কোথায়?', 'না না সাদা জিরে নয়, কালোজিরে', 'দই দিচ্ছ কেন, দই দিয়ে কী হবে?' আপনার ডান হাত থেকে দইয়ের বাটিটা আর বাঁ হাত থেকে

স্টিলের খুন্তিটা কেড়ে নিয়ে আপনাকে বিতাড়িত করে সহধর্মিনী এবার রান্নায় হাত দিলেন। আপনার স্বপ্নের দই ইলিশ কিংবা মাটন রেজালা রান্না করা আর হল না। তা হলে বলুন তো কী করে নিজের রুচিমতো খানা হবে?

এই ভর সন্ধ্যায় খালি পেটে লোভনীয় খাবারের কথা আর বলব না, বরং পরিধানে যাই।

পরিধান, অর্থাৎ জামা কাপড়। আপ্ত নির্দেশ হল অন্যের রুচি অনুযায়ী পোশাক পরবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত একটি আলোচনা পরে করছি, আগে দুয়েকটি তথ্য বিবেচনা করি।

মাত্র তিরিশ চল্লিশ বছরে বাঙালি স্ত্রী-পুরুষের সাজপোশাকের বিস্তর বদল হয়েছে। কিশোরী থেকে অনতিযুবতী বাঙালি মহিলার প্রধান পোশাক এখন শালোয়ার কামিজ, গ্রামে শহরে সর্বত্র। এটা বাড়ির বাইরের পোশাক, বাড়ির মধ্যে ম্যাক্সি বা ওই জাতীয় অন্য কিছু। মাত্র চল্লিশ বছর আগেও এ রকম সম্ভব ছিল না। শাশুড়ি মা ঝলমলে শালোয়ার কামিজ পরে, কপালে সিঁথিতে ডগমগে সিঁদুর, হাতে মোটা সাদা শাঁখা, বেনারসি পরিহিতা নতুন বউমাকে নিয়ে কালীঘাটে পুজো দিচ্ছেন, এখন এ অতি পরিচিত দৃশ্য। অথচ এই তো সেদিন, বড়জোর তিরিশ বছর, প্রথম যে মেয়েটি শালোয়ার কামিজ পরে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কাজে গেল, সে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। আর এখন তো মহিলারা প্যান্ট, লুঙ্গি, হাফ-শার্ট সব কিছুই পরিধান করছেন। ভালই দেখায়। সমাজও মেনে নিয়েছে।

পুরুষেরাও ধুতি থেকে প্যান্টে দ্রুত চলে এসেছে। পঞ্চাশের দশকে লালবাজারের বিখ্যাত গোয়েন্দা দেবী রায় ধুতি পরে অফিস যেতেন। রাইটার্সেও পদাধিকারিকেরা প্রায় সবাই ধুতি পরতেন, কেরানিবাবুরা তো বটেই।

ধুতি শাড়ি কাজকর্মের পৃথিবীতে প্রায় বিদায় নিয়েছে। প্রথমদিকে সবাই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। সেই সময়ের একটি গল্পে আছে ক্রু কাট চুল, রঙিন চকরাবকরা জামা, স্ট্রাইপ প্যান্ট পরা কৃশকায় এক যুবতীকে এক বিয়েবাড়িতে দেখে গঙ্গারাম যুবক ভেবেছিল। ভোজনের সময় মন্তব্য করেছিল, 'ওই ছেলেটি কিছুই খাচ্ছে না।' সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে প্রতিবাদ আসে, 'ও ছেলে নয়, মেয়ে, আমার মেয়ে। ডায়েটিং করছে।' গঙ্গারাম বক্তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলেছিল, 'আপনিই বুঝি ওই মেয়েটির বাবা?' সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ পোশাক করা পাশের ব্যক্তিটি প্রতিবাদ জানান, 'আমি ওর বাবা নই, আমি ওর মা।'

সাজপোশাক

আমার একটি রম্যরচনার বইয়ের ভূমিকায় আমি দরজির দোকানে আমার জামা বানাতে দেওয়ার বিপদের কথা বলেছিলাম।

শার্টের একটা কাটপিস বেশ কিছুকাল আগে কে যেন আমাকে উপহার দিয়েছিল। আলমারিতে কাপড়ের টুকরোটা পড়ে ছিল। ইতিমধ্যে আমার আয়তন হু হু করে বেড়ে গেছে।

ফলে দরজি মহোদয়, এতদঞ্চলে যাঁকে কোনও অজ্ঞাত কারণে সমীহবশত খলিফা সাহেব বলা হয়, আমাকে পেয়ে বসলেন। মাপটাপ নিয়ে দন্ত বিকশিত করে বললেন, 'স্যার, এটুকু কাপড়ে বড় জোর আপনার ফতুয়া হতে পারে, জামা হবে কী করে?'

ক্ষুণ্ণ চিত্তে আমি সেই বস্ত্রখণ্ডটি ফেরত নিতে যাচ্ছিলাম, খলিফা সাহেব বললেন, 'রেখে যান। আমি অন্য কাপড় জুড়ে ঠিকঠাক বানিয়ে দেব। একদম অন্যরকম জিনিস হবে।'

আমি একটু দ্বিধায় পড়লাম, প্রশ্ন করলাম, 'সে আবার কী রকম হবে?'

খলিফা সাহেব বললেন, 'একবার ট্রাই করে দেখুন না স্যার।'

দিন সাতেক পরে গিয়ে জামাটা পেলাম। ঠিক জামা নয় জার্সি। জার্সি বললেও কম বলা হয়। আমার হালকা নীল কাপড়টুকু দিয়ে বুক ও পিঠ হয়েছে, একটা হাত হলদে, একটা হাত সাদা, কলার ক্যাটক্যাটে লাল।

জামা দেখে আমি আঁতকে উঠলাম, খলিফা সাহেবকে বললাম, 'সর্বনাশ এটা গায়ে দিয়ে বেরোব কী করে? একেবারে হাস্যকর দেখাবে।'

এরপর খলিফাসাহেব আমাকে অনেকক্ষণ ধরে যা বোঝালেন, তার নিগূঢ়ার্থ হল যে হাস্যকর দেখানো হল এ যুগের ফ্যাশন এবং সেই অর্থে 'এটাই আধুনিকতম ফ্যাশনেবল জামা।' এটা নেব কি নেব না চিন্তা করছিলাম, কিন্তু এরপর খলিফার মজুরি ও অতিরিক্ত কাপড়ের দাম দিয়ে জামাটা নিয়ে চলে এলাম।

এই আখ্যানটি আমার উল্লিখিত রম্যগ্রন্থের ভূমিকায় সংযোজন করে বলতে চেয়েছিলাম, হাস্যকর আধুনিক ফ্যাশনের অনুসরণেই আমার এত সব তরল রচনা।

তা, খলিফা সাহেবের সেই জামা গায়ে দিয়ে বাইরে বেরোতে বিশেষ সাহস হয়নি। কলকাতায় তো নয়ই, এ দেশেই নয়। মার্কিন দেশে গিয়ে এক রৌদ্রমধুর নাতিশীতোষ্ণ মে মাসের দুপুরে ক্যালিফোর্নিয়ায় সানফ্রান্সিসকো শহরের শৌখিন সমুদ্রতটে একদিন হাঁটছিলাম। ওই চিত্রবিচিত্র শার্টটি গায়ে দিয়ে। হঠাৎ লক্ষ করলাম বেশ কয়েকজন বুড়ি মেমসাহেব সমবেত হয়ে জটলা করছেন আমার দিকে তাকিয়ে।

এক মুহূর্ত সময় লাগল না বুঝতে আমার শার্টটি তাঁদের চিন্তিত করে তুলেছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ওই জামা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল সমুদ্রতটে খুলে

ফেললাম। আতঙ্কিত হয়ে বুড়ি মেমেরা পড়ি-কি-মরি করে ছুটে পালালেন। আমিও উলটো দিকে ছুট দিলাম।

এরপরে আর কোনও অসুবিধা হয়নি। একটু দূরে গিয়ে বালি খুঁড়ে জামাটি পুঁতে ফেললাম। খুব কাছেই কোথাও একজন পুলিশ কর্মচারী ছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কার্যকলাপ দেখলেন। পোঁতা শেষ হয়ে যাওয়া মাত্র তিনি আমাকে দাঁড় করিয়ে উবু হয়ে বসে বালি খুঁড়ে জামাটি বার করে আনলেন।

ইয়াংকি ইংরেজিতে তিনি যা বললেন তা অবশ্য আমার বিশেষ বোধগম্য হল না। তবে মনে হল তিনি ভেবে নিয়েছেন এটি একটি মহামূল্যবান অঙ্গাবরণ। আমি যেখানে আছি সেখানে এত দামি জিনিসটি রাখতে আমি সাহস পাই না। তাই গোপনে সমুদ্রতটে বালির গভীরে পুঁতে রাখি এবং পরে প্রয়োজন মতো বালি খুঁড়ে বের করে পরিধান করি।

উক্ত পুলিশ কর্মচারী মহোদয়, যিনি সম্ভবত কোস্ট গার্ড বা সি পুলিশ (Sea Police, আমাদের যেমন রিভার পুলিশ) তাঁর ভ্রুকুঞ্চন দেখে অনুমান করলাম, তাঁর একটা জিজ্ঞাসা আছে।

জিজ্ঞাসাটা কী বুঝতে সময় লাগল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম। এই সুদীর্ঘ বালিতটে দিকচিহ্নহীন বেলাভূমিতে আমি কী করে যে জায়গায় জামা পুঁতেছি সে জায়গাটা খুঁজে পাই।

আমি বললাম, 'আমি মন্ত্র জানি।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিটি থমকিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি ভারতীয়?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

তিনি বললেন, 'তা হলে সবই সম্ভব।'

দূরে, বহু দূরে, প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানায় সূর্য তখন অস্তাচলগামী, শান্ত শীতল সূর্যের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

কাণ্ডজ্ঞান

না।

না। কাণ্ডজ্ঞান নয়।

খুব ভাল করে ভেবে বলছি আমি। 'কাণ্ডজ্ঞান' নামে কোনও রচনা কখনও লিখিনি। পাগলের কাণ্ডজ্ঞান লিখেছি, মাতালের কাণ্ডজ্ঞান লিখেছি, কিন্তু নির্ভেজাল কাণ্ডজ্ঞান, নৈব নৈব চ। কখনও নয়, কখনও নয়। কখনও 'কাণ্ডজ্ঞান' শিরোনামে কোনও লেখা আমি লিখিনি।

সারা জীবন ধরে কাগজ-কলম-কালি এবং সময় অপব্যয় করে রাশি রাশি কবিতা, গল্প, নিবন্ধ রচনা করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। কজনাই বা আমার লেখা পড়ে দেখেছে। আমার যা কিছু খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সে ওই 'কাণ্ডজ্ঞান' থেকে, যা ধারাবাহিক ভাবে দেশ পত্রিকায় প্রায় বিশ বছর আগে বেরিয়েছিল এবং পরে বই হয়ে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বেরোয়।

কিন্তু মজার কথা এই যে কাণ্ডজ্ঞান নামে আমার কোনও নির্দিষ্ট রচনা নেই, ধারাবাহিক রচনামালার নাম ছিল 'কাণ্ডজ্ঞান', পরে বইয়ের নামও হয় 'কাণ্ডজ্ঞান'।

তা এতদিন পরে পাপস্খালনের চেষ্টা করছি, অবশেষে কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে এই ছোট আলোচনা।

কাণ্ডজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, মহামতি নিউটনের সেই খরগোশের খাঁচায় দুটো দরজা করা। একটা খরগোশ বড়, একটা ছোট খরগোশ। নিউটন মিস্ত্রিকে বললেন, দুটো দরজা করতে, একটা বড় দরজা, বড় খরগোশের জন্যে, অন্যটা ছোট দরজা, ছোট খরগোশ যাতায়াত করবে। ছোট খরগোশ যে বড় দরজাতেও অবাধে যেতে পারবে, আসতে পারবে, তার জন্যে আলাদা দরজার প্রয়োজন নেই, সেই যৎসামান্য কাণ্ডজ্ঞানটুকু না থাকার জন্যেই জ্ঞানতপস্বী নিউটন হলেন মহামতি।

কাণ্ডজ্ঞান সম্বল আমাদের মতো সাধারণ মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শনের সীমায় গিয়ে আটকিয়ে যাই। আমাদের সমস্ত খরগোশের একটা দরজাতেই কাজ মিটে যায়।

পরশুরাম জ্ঞানমার্গের কথা বলেছিলেন। জ্ঞানমার্গে বিচরণের ক্ষমতা আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষের নেই। আমাদের নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান। কাণ্ডজ্ঞানের সীমানাতেই ফিরে যাচ্ছি।

সীমানা পশ্চিম গোলার্ধ। ইউরোপের কিংবা আমেরিকার কোনও বড় শহরের একটি পাঁচতারা হোটেল। অধিকাংশ পাঁচতারা হোটেলের অন্যতম তারা হল একটি সুইমিং পুল। এই পাঁচতারা হোটেলটিতে একটি দুটি নয়, পরপর তিনটি সুইমিং পুল। হোটেলের ম্যানেজার সাহেব সবাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান, 'এই প্রথমটা হল গরম জলের সুইমিং পুল, এটাই সবচেয়ে পপুলার।' এরপর আরেকটু এগিয়ে দ্বিতীয়টি দেখান, 'এটি হল ঠাণ্ডা জলের পুল, অনেকে এটাও পছন্দ করেন।' অবশেষে তৃতীয় একটি পুলের কাছে এসে

থামেন। এই পুলটি শূন্য, ঠাণ্ডা বা গরম জলটল কিছু নেই। ম্যানেজার বুঝিয়ে বলেন, 'আবার অনেক গেস্ট এমন থাকে, যে তাঁরা সুইমিং পুল চান কিন্তু জল পছন্দ করেন না। তাঁদের জন্যে এই শুকনো পুল।'

কাণ্ডজ্ঞানের নমুনা হিসেবে এই কাহিনীটি চমৎকার। তবে শুধু পাঁচতারা হোটেলের দুঁদে ম্যানেজারেরাই নয়, কাণ্ডজ্ঞান শিশুদেরও থাকতে পারে, নিরক্ষরদেরও থাকতে পারে।

মাস্টারমশায় শিশু ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যদি আমার বাঁ হাতে পাঁচটা আর ডান হাতে ছয়টা কমলালেবু থাকে তবে আমার হাতে'..., মাস্টারমশায় প্রশ্ন শেষ করার আগেই ছাত্র বলল, 'তবে আপনার হাত খুব বড় বড় স্যার। পাঁচটা-ছয়টা করে কমলালেবু একেক হাতে কম কথা নাকি।'

অবশেষে একটি পাড়াগেঁয়ে কাণ্ডজ্ঞানের গল্প বলার আছে। হরিরাম আর রামহরি গাছ থেকে নারকেল পাড়ছিল। হরিরাম গাছে উঠেছিল আর রামহরি নীচে নারকেল কুড়িয়ে গুছিয়ে রাখছিল। হঠাৎ এক কাঁদি নারকেল রামহরির মাথায় পতিত হয়ে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। ব্যাপার দেখে গাছের ওপর থেকে হরিরাম প্রশ্ন করে, 'রামহরি বেঁচে আছিস না মরে গেছিস?' ভূমিশয্যা থেকে রামহরি বলল, 'বেঁচে আছি।' হরিরাম বলল, 'তুই যা মিথ্যেবাদী হয়তো মরে গেছিস, বলছিস বেঁচে আছি।' রামহরি বলল, 'আমারও মনে হচ্ছে আমি মরে গেছি, না হলে তুই আমাকে মিথ্যেবাদী বলার সাহস পাস কী করে?'

শুভ নববর্ষ

শুভ নববর্ষ।

শুভ নববর্ষ। হ্যাপি নিউ ইয়ার।

নববর্ষ উপলক্ষে অন্তর্জালের (ইন্টারনেটের) সমস্ত পাঠক-পাঠিকাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

যারা বহুকাল সুদূরের প্রবাসী, দেশান্তরী, জন্মগত দেশাচার, লোকাচার এখন যাদের কাছে আবছা আবছা স্বপ্নের মতো তারা হয়তো অবাক হবেন, এই মধ্য এপ্রিলে নববর্ষ?

তাঁরা হয়তো লেখক সম্পর্কে ভাবেন, ধারদেনা করে তারাপদ রায়ের মাথাটা একদম গেছে। না হলে, সাড়ে তিন হাত তফাতে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'।

বিলেত আমেরিকা তো আর বাংলাদেশ নয়। সে সব দেশে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের পর হ্যাপি নিউ ইয়ার বেমানান। কিন্তু বঙ্গভূমে কথা আছে 'যাবৎ দোল তাবৎ কোল'। এ কথার সরল মানে হল, বিজয়ার কোলাকুলি দোল পর্যন্ত চলবে। আমাদের গয়ংগচ্ছ দেশে আশ্বিন থেকে ফাল্গুন এই ব্যবধান মানিয়ে যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্য পৃথিবীর ইউরোপ আমেরিকাতে শশব্যস্ত ভুবনে এই দীর্ঘসূত্রতার সুযোগ নেই।

না। আমি কোনও সুযোগ নিচ্ছি না। আমি বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Circa 2001 নয়, বাংলা ১৪০৮ সন।

দেশান্তরী পাঠক, দীর্ঘ প্রবাসিনী পাঠিকা মনে আছে পয়লা বৈশাখ? মনে আছে পঁচিশে বৈশাখ?

সব গেলেও এই দুটো বাংলা তারিখ বাঙালির জীবন থেকে আজও যায়নি। আর আছে আশ্বিন, সাদা মেঘের, ছড়িয়ে পড়া শিউলি ফুলের অমল আশ্বিন, পুজোর আশ্বিন। ঘরে ফেরার আশ্বিন।

আশ্বিন এখনও দূরে, মধ্যে মধ্যে বিকেল সন্ধ্যায়, অনেক দিন রাতেও হালকা ঝড় বৃষ্টি হয়ে একটা ঠাণ্ডা ভাব।

দূরের মানুষেরা আপনাদের মনে পড়ে সেই মর্নিং স্কুল, সেই বকুলতলায় ফুল কুড়োনো, মালা গাঁথা। সেই হঠাৎ ফুটে ওঠা গন্ধরাজ আর বেলফুলের উতলা গন্ধ। সেই ঘ্রাণ অত দূরে এত কাল পরে আর কি পৌঁছোয়?

***

বাংলার পয়লা বৈশাখ লিখতে গেলে ১লা বৈশাখ, যেমন ইংরেজিতে first না লিখে লেখা হয় 1st January।

বন্ধুবর বুদ্ধদেব গুহ গত বছর একটি সাময়িকীর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে একটি

শিশু তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল বৈশাখ একলা কেন? কিঞ্চিৎ চেষ্টা করে বুদ্ধদেব বুঝতে পেরেছিলেন এই একলা (১লা) হল পয়লা। শিশুটি কোথাও ১লা শব্দটি দেখেছে এবং তার কৌতূহল হয়েছে।

পরিহাসের ব্যাপার নয়। নববর্ষের সকালে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে কেমন যেন খুব একলা মনে হল নিজেকে। গত জন্মের ঝিরিঝিরি সুশীতল বাতাস বইছে, কতকাল আগের পাখি ডাকছে সুরে সুর মিলিয়ে। কত মানুষ হারিয়ে গেছে আর কোনওদিন দেখা হবে না। কত স্মৃতি, অনন্ত বিষাদ।

বিষাদ সিন্ধুর জলে তরতর করে বয়ে চলেছে জীবনতরী। কত দিন—মাস—বছর, দশকের পর দশক পার হয়ে গেল, এক শতক অন্য শতকে পৌঁছোল। নতুন বছরে পা দিয়ে বারবার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে।

পুনশ্চ:

নতুন বছরে ভাবাবেগ একটু থাকবেই। তাই বলে রঙ্গ-রসিকতা বাদ যাবে! তা হয় না। এই টেলি কথোপকথনটি নববর্ষের উপহার:

—হ্যালো, হ্যালো, কে মধুমালতী?

—হ্যালো, হ্যাঁ আমি মধুমালতী বলছি।

—মধু, মধুমালতী তোমাকে শুভ নববর্ষের অঢেল ভালবাসা...

—হ্যালো, আমারও তাই।

—মধু, মধুমালতী, আজ নতুন বছরের দিনে বলো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না?

—কেন করব না। নিশ্চয় করব।

—কথা দিচ্ছ। প্রমিস।

—প্রমিস। কথা দিচ্ছি, তোমাকে বিয়ে করব। কিন্তু তুমি কে কথা বলছ?

দুর্ঘটনার আগে

লবণহ্রদে, কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠে যে শহরতলি বা উপনগরীতে যেখানে আমার বর্তমান অবস্থান, সেই সল্টলেকের অধিকাংশ অধিবাসীই হলেন চাকুরিজীবী অথবা অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবী। নিতান্ত ছাপোষা মধ্যবিত্ত। প্রায় সকলেরই অফিস থেকে ধার নিয়ে বাড়ি করা।

ফলে বাড়িগুলির অধিকাংশই একবারে তৈরি নয়, ধাপে ধাপে করা। অফিস থেকে বা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি থেকে যেমন যেমন ঋণ পাওয়া গেছে সেইভাবে ক্রমশ তৈরি হয়েছে।

প্রথমে অনেক বাড়িই একতলা, ন্যাড়া ছাদ। এই রকম একটি বাড়ির ন্যাড়া ছাদে গত বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সন্ধ্যাবেলা এক বালক ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ছোটাছুটি করছিল।

ভয়াবহ ব্যাপার। সামান্য অসতর্ক হলে যা তা কাণ্ড হতে পারে।

বালকটির বয়েস এই সাত-আট। তার ভাল নাম যাই হোক, ডাকনাম গুণ্ডা—পিতামহীর ভালবাসার ডাক।

পিতামহী গুণ্ডা বলতে অজ্ঞান। সেই পিতামহীর অজ্ঞাতসারে গুণ্ডা ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ছাদে উঠেছে। পাশের বাড়ির একটি ছেলে রাস্তা থেকে জানালা দিয়ে খবর দিল, 'ঠাকুমা, গুণ্ডা ছাদে উঠেছে।'

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ভরসন্ধ্যায় গুণ্ডা ছাদে কী করছে?'

গুণ্ডার বন্ধু জানাল, 'ও ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ভো-কাট্টা খেলছে।' ঠাকুমা ছুটে ছাদে উঠতে গিয়ে দেখলেন ধূর্ত গুণ্ডা ছাদের শিকল ভিতর দিক থেকে টেনে দিয়েছে।

ঠাকুমা অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন কিন্তু গুণ্ডা দরজা খুলল না। গুণ্ডা ঠাকুমার আকুতিতে কর্ণপাত করল না।

বাধ্য হয়ে ঠাকুমা সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তায় গেলেন। রাস্তায় গিয়ে ছাদের ওপরে নাতিকে দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন, তখনও যে দুর্ঘটনা হয়নি, নাতি যে ছাদ থেকে নীচে পড়ে যায়নি, সেটাই আশ্চর্য। আকাশে সন্ধ্যার আবছায়ায় অস্পষ্ট ঘুড়ি আর নীচে ছাদের ওপরে লাটাই হাতে সতত সঞ্চরমান গুণ্ডা।

ঠাকুমা রাস্তা থেকে চেঁচাতে লাগলেন, 'এই গুণ্ডা নেমে যায়। পড়ে গেলে শেষ হয়ে যাবি।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে, গুণ্ডা ঘুড়ি উড়িয়েই চলেছে। তখন ঠাকুমা বলতে বাধ্য হলেন, 'এরপর যখন ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকবি, তখন কাঁদতে কাঁদতে "ঠাকুমা, ও ঠাকুমা" বলে ছুটে আসবি না যেন।'

এই বৃদ্ধাকে কে বোঝাবে যে হাত-পা ভেঙে গেলে তাঁর নাতি মোটেই ছুটে আসতে পারবে না।

দুর্ঘটনা বিষয়ে আরেকটি অবুঝ গল্প মনে পড়ছে।

অনিলবাবুর বাড়ির কিছু দূরে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং। সেটা পার হয়ে স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে তাকে অফিস যেতে হয়।

সেদিন কোনও কারণে অনিলবাবু অফিসে যাননি, সকালবেলা বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী বলাইবাবু এসে বললেন, 'যাক আপনি বেঁচে আছেন!'

অনিলবাবু বললেন, 'আমি বেঁচে আছি মানে?'

বলাইবাবু, এক চুমুকে এক গেলাস জল খেয়ে বললেন, 'কী সাংঘাতিক কাণ্ড!'

অনিলবাবু বললেন, 'কী সাংঘাতিক কাণ্ড?'

বলাইবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে আপনি রেলে কাটা পড়েছেন।'

অনিলবাবু বললেন, 'আমি রেলে কাটা পড়েছি?'

বলাইবাবু বললেন, 'লেভেল ক্রসিংয়ে তাই তো দেখলাম, ঠিক আপনার মতো গায়ের রং, হাইট, গড়ন সবই একরকম, জিনসের প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক লাইনে কাটা পড়েছেন।'

চিন্তিত হয়ে অনিলবাবু বললেন, 'কী রঙের জিনস?'

বলাইবাবু বললেন, 'একেবারে আপনারটার মতো লাইট ব্লু।'

মুহ্যমান অনিলবাবু জানতে চাইলেন, 'গায়ে স্ট্রাইপ হাফশার্ট?'

বলাইবাবু বললেন, 'ঠিক তাই।'

অনিলবাবু ঘামতে ঘামতে বললেন, 'তা হলে? তা হলে তো আমিই কাটা পড়েছি। কী সাংঘাতিক!' তারপর একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'লোকটার মাথায় চুল কেমন?'

বলাইবাবু বললেন, 'খুব চুল, ব্যাকব্রাশ করা।'

অনিলবাবু বললেন, 'বাঁচালেন। এ লোক আমি নই। আমার তো মাথায় টাক।'

'টাক না দেখে আমিও সেই সন্দেহ করেছিলাম', বলাইবাবু কবুল করলেন।

দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনাই যখন বিষয়বস্তু তবে বিমান দুর্ঘটনা দিয়েই শুরু করি।

খবরের কাগজের পাতায়, বিভিন্ন বৈদ্যুতিন তথা বেতার মাধ্যমে বিমান দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। কামকাটকায় বিমান ভেঙে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, সে খবর কাগজের প্রথম পাতায় আর ঘরের পাশে বরিশালে নৌকাডুবিতে তিরিশজন নিহত, চল্লিশজন নিখোঁজ সে খবর সপ্তম পাতায়। বাস দুর্ঘটনা, ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহত শতাধিক না গেলে তেমন পাত্তা পায় না।

বিমান ভ্রমণের আদি যুগে, আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রমথ সমাদ্দারের কার্টুন দেখেছিলাম, বিমান ভেঙে পড়ে আছে। এক গুরুতর আহত যাত্রী অচেতন ভূমি-শায়িত পাইলটকে ধাক্কা দিয়ে প্রশ্ন করছে, 'ও পাইলট সাহেব, বেঁচে আছেন কি? আমার রিটার্ন টিকিটের কী হবে?'

অধিকাংশ দুর্ঘটনাতেই অবশ্য রিটার্ন টিকিটের সমস্যা থাকে না, সেগুলো ইংরেজিতে যাকে বলে fatal accident, বাংলায় বলা হয় মারক দুর্ঘটনা।

আমরা ও রকম দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাব। আমাদের এ বারের আলোচ্য বিষয় একটি সামান্য কান-কাটার কাহিনী।

দুর্ঘটনা সংক্রান্ত এই কাহিনীটি আগেও বলেছি। পুরনো গল্প। তবে আগে যাঁরা শুনেছেন বা পড়েছেন তাঁদেরও হয়তো খারাপ লাগবে না।

উল্টোডাঙা আজাদ হিন্দস মিল একটি কাঠ চেরাইয়ের কারখানা। এখানে বৈদ্যুতিক করাতে সব রকম কাঠ কাটা হয়। হেডমিস্ত্রি বঙ্কুবাবু মাপমতো কাঠ কাটা হচ্ছে কি না পেনসিল-নোটবুক নিয়ে তার তদারকি করছিলেন। কী মাপে কাঠ কাটা হবে, নোটবুকে পেনসিল দিয়ে হিসেব কষে তিনি চেরাই মিস্ত্রিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

হঠাৎ লোডশেডিং হল, বিদ্যুতের করাত খ্যাচাং করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে বিদ্যুৎ ফিরে আসতে আবার চেরাই মেশিন চালু করা হল। কিন্তু কোথাও এবার একটু গোলমাল হয়েছে।

করাতের মধ্য থেকে কেমন একটা কিচি-কিচ কিচি-কিচ শব্দ বেরোচ্ছে, করাতের গতিও এলোমেলো। বঙ্কুবাবু হেডমিস্ত্রি, কারখানার সব দায়িত্ব তাঁর, তিনি আগ বাড়িয়ে দেখতে গেলেন করাতের কী হয়েছে।

এরই মধ্যে চেরাই মিস্ত্রি সোলেমান করাত কলের ওপর থেকে 'বঙ্কুদা সাবধান, বঙ্কুদা সাবধান' বলে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু তখন আর সাবধান হওয়ার সুযোগ নেই। বঙ্কুমিস্ত্রির ডান কান করাত কলে খ্যাচাং করে কেটে মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কানটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে চেরাই করা কাঠের ফাঁকে গিয়ে পড়েছে। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি কাঠ সরিয়ে কান উদ্ধার করা হল। এবার বঙ্কুমিস্ত্রিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে

দেখতে হবে কানটা জুড়ে দেওয়া যায় কি না।

বঙ্কুমিস্ত্রি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন, কাটা জায়গাটা দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কানটা কুড়িয়ে এনে বঙ্কুবাবুকে দেখাতে, তিনি কিন্তু একবার দেখেই বলে দিলেন, 'এ কান আমার নয়।'

কেন নয়? এখানে আরেকটা কাটা কান আসবে কোথা থেকে? এই রকম সব প্রশ্নের জবাবে বঙ্কুবাবুর একটাই জবাব, 'ওটা আমার কান হতেই পারে না। আমার কানের পিছনে আমার পেনসিল গোঁজা ছিল। এটার পিছনে তো পেনসিল নেই।'

পেনসিলটা কাঠের গাদার পাশেই পড়ে ছিল। একজন সেটা কুড়িয়ে এনে দিল। সেটা হাতে নিয়ে বঙ্কুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ এটা আমার পেনসিল কিন্তু এই কাটা কানটা আমার নয়।'

সরাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'কেন আবার?' বলে কাটা কানটা বাঁ হাতে এবং পেনসিলটা ডান হাতে ধরে সেই কানটায় পেনসিলটা গোঁজার চেষ্টা করে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন যে, 'ওই কানটায় পেনসিল গোঁজা যাচ্ছে না। এ কানটা আমার হতে পারে না। আজ তিরিশ বছর ধরে কানে পেনসিল গুঁজে আসছি। পেনসিল গোঁজা যাচ্ছে না আর এখন আমি তোমাদের চাপে পড়ে স্বীকার করব যে এটা আমার কান?'

ধারদেনা

অনেক ভেবে চিন্তেই নাম দিলাম 'ধারদেনা'।

আসলে আমার প্রায় সমস্ত রচনাই তো ধারদেনা করে লেখা। এখানে পড়ে, ওখানে শুনে, সেখান থেকে টুকে বা অনুবাদ করে রস-রসিকতার কাগজের ফুল দিয়ে মালা গেঁথে যাচ্ছি, সে যে কত ভাল! এর মধ্যে কখনও, কদাচিৎ আমার নিজস্ব দুয়েকটি অবদান যে মেশানো থাকে না, তা নয়। কিন্তু সে সব গৌণ ব্যাপার।

ইতিমধ্যে নতুন করে একটা গোলমেলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আজ কিছুদিন হল লক্ষ করছি, আমার নিজেরই পুরনো গল্প ঘুরে ফিরে অন্য চেহারায় এসে যাচ্ছে আমার লেখায়। চৌর্যবৃত্তি, আমি যাকে বলছি ধারদেনা, ইংরেজিতে একে বলে প্ল্যাজিয়ারিজম (plagiarism), চিরকালই আছে। অনেক গণ্যমান্য, দিকপাল ব্যক্তি এ দোষে দোষী। তবে আমি হলাম প্ল্যাজিয়ারিজমের নিকৃষ্টতম উদাহরণ, নিজের রচনা থেকে পর্যন্ত চুরি করছি।

তার ওপর চুরি করে বলছি ধারদেনা। এর মধ্যে শুধু চুরি নয়, যথেষ্ট জোচ্চুরিও যাচ্ছে।

সে যা হোক ধারদেনা রচনার শুরুতে এই সম্পর্কটির দিকে একটু তাকিয়ে দেখি।

ধার এবং দেনা এই দুটি সমার্থবাচক শব্দ একত্রিত হয়ে ধারদেনা হয়েছে। ধার ও দেনা, ধারদেনা কিন্তু ঠিক দ্বন্দ্বসমাস নয়। ধার আর দেনা বলতে গেলে একই জিনিস; কিন্তু দুটি শব্দ যুক্ত হয়ে জোরালো হয়েছে, যেমন 'বাজারে আমার অনেক ধার', এর চেয়ে অনেক বেশি অর্থবহ 'বাজারে আমার অনেক ধারদেনা।'

ব্যাকরণের কথা থাক। এই কলম ব্যাকরণের জ্ঞানের জন্য নয়, এই কলম রঙ্গ-রসিকতার জন্যে।

এই যে বলছিলাম রঙ্গ-রসিকতার স্টক আমার ফুরিয়ে গিয়েছে, একটা গল্প দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাই। এই গল্পটাও দুনম্বরী, তবু বলতে হচ্ছে।

আশুবাবু আমার প্রতিবেশী। ভদ্রলোক কলকাতার কাছেই একটা মিউনিসিপ্যালিটিতে কী একটা চাকরি করেন। সেদিন সন্ধেবেলা মুখ শুকনো করে ভদ্রলোক এসে বললেন, 'আজ আমার চাকরিটা চলে গেল'।

কথাটা শুনে খারাপ লাগল। এই বাজারে চাকরি চলে গেল। কিন্তু কেন?

আশুবাবু নিজেই বললেন, বাজে রামপুর পৌরসভায় তিনি ছিলেন ডগ-ক্যাচার। তাঁর ছিল রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর ধরার চাকরি। অত্যুৎসাহে তিনি বাজে রামপুরের রাস্তার সব কুকুর ধরে ফেলেছেন, এখন বাজে রামপুরের রাস্তায় আর একটিও কুকুর নেই। এরপর তাঁর আর চাকরি থাকে কী করে?

আমারও হয়েছে ওই আশুবাবুর দশা। আমার সব কুকুর ধরা হয়ে গিয়েছে, এখন

বেকার হওয়ার অবস্থা।

কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র আমি নই। দুয়েকটা নতুন রসিকতা অবশ্যই আমি করব, কিন্তু আজ নয়। আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি, আজ আমার প্রিয় বান্ধবীর পঞ্চাশতম জন্মজয়ন্তীর সপ্তম বার্ষিকী। আবার দেখা হবে।

দম্পতি

প্রিয় বান্ধবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে যৎকিঞ্চিৎ দাম্পত্য বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিড়ম্বনার সূচনা অবশ্য বহুকাল আগেই যবে আমি আমার মাননীয় সহধর্মিনী মিনতি রায়কে বিউটি পারলার থেকে ফেরার পরে বলেছিলাম, 'তোমাকে ঠিক পরস্ত্রীর মতো দেখাচ্ছে।'

আপনারা অনেকে হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন, এর চেয়েও একটি বিপজ্জনক উক্তি আছে আমার, সেটাকে অবশ্য স্বীকারোক্তির পর্যায়ে ফেলা চলে। অনেক ভেবেচিন্তে, বিবেচনা করে একদা আমি কবুল করেছিলাম যে আমাদের বাড়িতে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কারওর ভাল বিয়ে হয়নি।

না। পুরনো দাম্পত্য নিয়ে আর একটি কথাও নয়। একটি মাত্র সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করে অন্য দম্পতিদের নিয়ে পড়া যাবে।

কিছুদিন আগে সন্ধ্যাবেলা আমি ও মিনতি সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছি। চিরদিনই আমি একটু তাড়াতাড়ি হাঁটি, অবশ্য এখন স্থূলাকার হয়ে, বয়েস বেড়ে গতি একটু কমেছে। মিনতি চিরদিনই রমণীসুলভ লঘু পায়ে হাঁটে।

তা, সেদিন রাস্তার মোড়ে এক পরিচিত প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা। আমাকে নমস্কার করার সময় তিনি একটু দূরে, বিশ-পঁচিশ গজ পিছনে মিনতিকে দেখলেন। আমাদের এই ব্যবধান দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'তারাপদদা, বউদি যে পিছিয়ে পড়েছেন।'

আমি পিছনে তাকিয়ে মিনতিকে একবার দেখে ভদ্রলোককে বললাম, 'ভাই সাড়ে ছত্রিশ বছর এক সঙ্গে হাঁটছি, এবার যদি বিশ-পঁচিশ গজ পিছিয়েই পড়ে, তা হলে কী আর করা যাবে?'

কবি বলেছিলেন, 'বহুত মিনতি করি তোয়।' আমারও প্রায় সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এবার একটু মুখ বদল করি।

বছর পাঁচেক বিয়ে হয়েছে মাধবী ও মাধবের। মাধব খুবই বাধ্য স্বামী। একদা বেপরোয়া মাধবকে এখন প্রায় স্ত্রৈণই বলা চলে। মাধবীর কথা শুনেই সে চলে।

কয়েক সপ্তাহ আগে মাধবী একটি কুকুর ছানা কিনে এনেছে। ডগ ট্রেনিং সংক্রান্ত একটি বিলিতি পেপারব্যাক সংগ্রহ করে সে কুকুর শাবকটিকে নানা জিনিস শেখানোর চেষ্টা করছে। তার কারিকুলামের মধ্যে রয়েছে, সোফায় না বসা, খাওয়ার টেবিলে না ওঠা, বাইরের দরজার কাছ থেকে খবরের কাগজ মুখে করে নিয়ে আসা ইত্যাদি।

কিন্তু কুকুর ছানাটি বড় অবাধ্য, যাকে বলা চলে বেয়াড়া। মাধবীর চেষ্টার ত্রুটি নেই, কিন্তু কুকুর ছানাটি কিছুই শিখছে না। মাধবী হাঁপিয়ে যাচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। কুকুর ছানাটি মাধবীর হাতে মারও খাচ্ছে খুব।

সব দেখে মাধব বলল, 'এত চেষ্টা করে কিছু লাভ নেই, এ কুকুর কিছু শিখবে না।

এটাকে রাস্তায় ছেড়ে দিলেই হয়।'

এ শুনে মাধবী বলল, 'দেখো ধৈর্য ধরতে হবে। তুমি একদিনে বাধ্য হওনি, তোমাকে শেখাতেও আমাকে কম কষ্ট করতে হয়নি। সে জন্যে কি তোমায় আমি রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিলাম?'

বিজনের রক্তমাংস

পঞ্চাশের দশকে 'বিজনের রক্তমাংস' নামে এক তরুণ লেখকের একটি গল্প খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই রচনার সঙ্গে সেই গল্পের কোনও সম্পর্ক নেই।

এই রচনা যে বিজনকে নিয়ে সে আমার ছোট ভাই। বিজনের কথা আমি মাঝে মধ্যেই লিখি। আপনারা অনেকেই তাকে চেনেন।

বিজন হল সেই ব্যক্তি যে একবার নিউ মার্কেটে মাংস কিনতে গিয়ে শুধু পেঁয়াজ আর আলু কিনে, মাংসের খালি থলে হাতে ফিরে এসেছিল। 'মাংস কী হল' জানতে চাওয়ায় সে বলেছিল 'মাংস নেই। পাঁঠারা স্ট্রাইক করেছে।' অনেক রকম জেরা করার পর অবশেষে জানা যায়, পাঁঠা-খাসি নয়, স্ট্রাইক করেছে নিউ মার্কেটের মাংসের দোকানিরা, পুরসভা নতুন কী বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, তারই প্রতিবাদে।

চিনতে পারছেন বিজনকে?

এই বিজনকেই বেড়ালে কামড়ে দিয়েছিল। তখন তার দশ বছর বয়েস, ফোর না ফাইভে পড়ে। ইস্কুলের হোমটাস্কে ছিল বেড়াল-এর ওপরে রচনা লেখার কাজ।

যেহেতু বেড়ালের ওপর রচনা লিখতে দিয়েছে, তাই খাতায় না লিখে একটা হুলো বেড়ালকে কোলের ওপর চিত করে শুইয়ে বিজন সেই হুলোর পেটের ওপরে রচনা লিখছিল। রচনাটির প্রথম পংক্তি 'আমি বিড়াল ভালবাসি' লেখার আগেই বুড়ো হুলোটি হঠাৎ খ্যাঁক করে বিজনের হাতে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

বিজন সমগ্র লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আমি অতটা পারব না। তা ছাড়া এখানে ওখানে বিজনের নাম উল্লেখ না করে সে সব গল্প অনেকবার অনেক রকম করে লিখেছি।

আপাতত বিশদ গল্পে যাচ্ছি না।

প্রথমে বিজনের বুদ্ধির একটা নমুনা পেশ করছি।

বিজন একদিন বাজার থেকে বেশ বড় একটা এঁচোড় নিয়ে এসেছে। ঠিক বঙ্গীয় এঁচোড় নয়, সুবৃহৎ মাদ্রাজি কাঁচা কাঁঠাল, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে যেগুলো গ্রীষ্মকালে কলকাতায় চালান আসে। আকারে বড় হলেও তরকারি হিসেবে বাংলা এঁচোড়ের মতো উপাদেয় নয়।

বিজনের বউদি, মানে আমার স্ত্রী মিনতি, এই এঁচোড় দেখে বেশ একটু রাগারাগি করলেন, তার সঙ্গে সঙ্গত করলেন আমাদের কাজের মেয়ে কানন। তিনি কাঁঠালটা সিকি পরিমাণ কুটে আর কুটলেন না, দেখালেন ভেতরটা পেকে হলুদ হয়ে এসেছে, বললেন, 'পাকা কাঁঠাল দিয়ে এঁচোড়ের ডালনা হবে কী করে?'

যেটুকু কোটা হয়েছিল তাই দিয়েই অল্প করে এঁচোড়ের তরকারি করা হল। বাকি

অংশ বিজন দখল নিল। সে একটু শুঁকে আমাদেরও শুঁকতে দিল। হলুদ হয়ে আসা কোয়াগুলোতে পাকা কাঁঠালের অল্প ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। বিজন আমাদের বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা আছে না, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো?' আমি কবুল করলাম, 'হ্যাঁ তা আছে।'

বিজন তখন একটা চটের থলের মধ্যে কাঁঠালটা ঢুকিয়ে মশলা বাটা নোড়া দিয়ে ধীরে ধীরে পেটাতে লাগল। বিজনের কলাকৌশলে সেদিন দুপুরে এঁচোড়ের তরকারি ছাড়াও ওই একটা কাঁঠালের কোয়া আমরা বিকেলে মুড়ি দিয়ে খেলাম। পিটিয়ে নরম হয়েছে কোয়াগুলো, কিন্তু কেমন যেন ছিবড়ে ছিবড়ে, তা ছাড়া পানসেও বটে মিষ্টি কম।

কী আর করব, কনিষ্ঠ সহোদরের অনুরোধে ওই কাঁঠাল তিন কোয়া খেলাম। কিন্তু শতাধিক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল রাতের ভোজনের জন্যে।

রাতে ডালের সঙ্গে সাধারণত ভাজা কিছু থাকে না। কিন্তু সেদিন ছিল। কাঁঠালের বিচি ভাজা। দুপুরে যে এঁচোড়ের ডালনা খেয়েছি, বিকেলে যে কাঁঠালের কোয়া খেয়েছি তারই বিচি ভাজা। কাঁচা কাঁঠালের বিচি, তাই ভাজার মধ্যে একটু কষা স্বাদ, কিন্তু খেতে খারাপ লাগল না। ডালের সঙ্গে ভাত মেখে মুচ মুচ করে খেলাম।

ব্যাপারটা আমাকে এত চমকিত করে ফেলল যে বর্ণনা করা কঠিন। একই কাঁঠালের দুপুরে তরকারি, বিকেলে পাকা কোয়া, রাতে বিচি ভাজা—একই দিনে শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য। অভিভূত অবস্থায় সাতদিনের মধ্যে এই বিষয়ে একটা উপন্যাস রচনা করেছিলাম। বিশ্বাস না হয়, আমার লেখা নতুন উপন্যাস 'সর্বনাশ' পড়ে দেখবেন।

কফিন

বহু বছর আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক অসামান্য কবিতায় একটি মর্মস্পর্শী মন্তব্য করেছিলেন।

'...কফিন খালি নাই।'

মৃত্যুমুখী এই হাহাকারের কোনও স্থান সাপ্তাহিক এই রম্যনিবন্ধমালায় নেই। এখানে শুধু হাসির কথা, হালকা কথা, হালকা হাসির কথা।

কিন্তু আমার মুশকিল হয়েছে এই যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অবিচ্ছিন্ন আজ বেশ কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক রম্যরচনা লিখে লিখে আমার হাতে নতুন আর কোনও বিষয় নেই। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, অফিস-কাছারি-ইস্কুল, ডাক্তার-উকিল-আমলা, স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা এমন কোনও জিনিস আছে যা নিয়ে আমি লিখিনি অথবা আমাকে লিখতে হয়নি?

অবশেষে দেওয়ালে পিঠ। এবার একেবারে কফিনে এসে পৌঁছেছি। ইংরেজিতে একটা পুরনো কথা আছে না, কফিনে শেষ পেরেক, আমার ক্ষেত্রে পেরেক নয়, আস্ত কফিন।

কফিন সম্পর্কে আমাদের ভারতীয় হিন্দুদের ধারণা খুব ঝাপসা। আমাদের তো মৃত্যুর পরে মুখাগ্নি এবং চিতাশয্যা। সেখানে কাঠের বাক্সে সুখনিদ্রার কোনও প্রশ্ন নেই।

কফিন সম্পর্কে একটা বহু পুরনো ধাঁধা আছে। অবশ্য ধাঁধার মজা শতকরা নব্বইভাগ উবে যায় যদি ধাঁধার উত্তর আগেই বলে দেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে ধাঁধার উত্তর যে 'কফিন' সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উত্তর জানা সত্ত্বেও আমরা এই ধাঁধাটির মজা উপভোগ করতে পারি।

তিনটি প্রশ্ন:

(১) কোন জিনিস যে বানায় সে ব্যবহার করতে পারে না।

(২) কোন জিনিস যে কেনে সে নিজের ব্যবহারের জন্যে কেনে না।

(৩) কোন জিনিস যে ব্যবহার করে কখনও জানতে পারে না কিংবা জানাতে পারে না, জিনিসটা কেমন।

বলা বাহুল্য জিনিসটা কফিন।

অবশ্য, আজকাল অনেক সেয়ানা এবং ধনবান ব্যক্তি মৃত্যুর আগেই নিজের কবরের জন্যে বহুমূল্য জমি কিনে রাখেন, বহু সহস্র টাকা খরচ করে নিজের জন্যে সুদৃশ্য কফিন বানিয়ে রাখেন, যাতে মৃত্যুর পরে বিলাসের কোনও খামতি না হয়।

কফিন সম্পর্কে হাসির গল্প বিশেষ শুনিনি বা পড়িনি। সেটাই স্বাভাবিক, মৃত্যু নিয়ে হাসি-ঠাট্টা সুরুচির পরিচয় নয়। শুধু একটিমাত্র যে গল্পটি আমি জানি সেটি স্মরণ করছি।

মার্কিন দেশের এক সুপ্রসিদ্ধ মহানগরীর একপ্রান্তে একটি অভিজাত কবরখানা। এটি

একটি বহুজাতিক গোরস্থান। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষদের কবর দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

একদিন অপরাহ্নে সেই কবরখানায় দুটি কফিন পাশাপাশি নেমেছে। তার একটি এক মার্কিন সাহেবের আর অন্যটি চিনে সাহেবের। মার্কিন সাহেবের কফিনের পাশে গুচ্ছ-গুচ্ছ সুগন্ধি গোলাপ খুব যত্ন করে সাজানো।

চিনে সাহেবের কফিনের পাশে তাদের ধর্ম ও আচার মেনে আত্মীয়েরা ভাল ভাল চিনে খাবার, মাছ, মাংস, ফ্রায়েড রাইস এইসব বাটিতে করে সাজিয়ে দিয়েছে।

দুটি কফিনের দূরত্ব খুব বেশি নয়। মার্কিন সাহেবের কফিনের পাশে দণ্ডায়মান এক যুবক চিনে সাহেবের কফিনের পাশে খাদ্যদ্রব্য দেখে এবং তার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেই চিনে খাবারের কফিনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'এই খাবারগুলো কী হবে?'

যে বৃদ্ধ চৈনিক যাজক কফিনের সঙ্গে এসেছিলেন তিনি বললেন, 'মৃতের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যে এই খাবারগুলি দেওয়া হয়েছে।'

মার্কিন যুবকটি কিঞ্চিৎ প্রগলভ, সে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো মৃত ব্যক্তি কখন খাবেন?'

চৈনিক যাজক বললেন, 'তোমাদের কফিনস্থ ব্যক্তিটি যখন তোমাদের গোলাপ ফুলের গন্ধ শুঁকতে আসবেন।'

ডাক্তারবাবু

আগেরবার স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ডাক্তারবাবুদের কথা কিছু লিখেছি। স্বাস্থ্য সম্পর্কে লিখব কিন্তু ডাক্তারবাবুদের কথা লিখব না তা তো হতে পারে না।

কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। বার্কলে থেকে আমার ছেলে কৃত্তিবাস ফোন করে বলল, 'বাবা, তোমার "স্বাস্থ্য" একদম ভাল নয়। তুমি ডাক্তারদের নিয়ে তোমার সেই পুরনো গল্পগুলো বললে না কেন?'

ছেলেকে কিছু বললাম না বটে। কিন্তু মনে মনে স্থির করলাম আমার এই বয়েসে ডাক্তার খেপিয়ে সুবিধে হবে না। আমার পুরনো গল্পগুলো থেকে অতি সাবধানে বেছে নিয়ে ডাক্তারবাবুদের পক্ষে বা বিপক্ষে নয় এমন দুয়েকটা গল্প বলি।

প্রথম গল্পটি আমি দুভাবে শুনেছি। দুটো গল্পই প্রায় এক জাতের, সামান্য একটু রকম ফের।

হাড়কৃপণ নিতাইবাবু পাড়ার ডাক্তারকে দেখাতে গিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবুর নিতাইবাবুকে কেমন চেনাচেনা মনে হল, যা হোক কিছু না বলে তাঁকে খুব ভাল করে অনেকক্ষণ সময় দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর যত্ন করে প্রেসক্রিপশন লিখলেন।

নিতাইবাবু যত্ন সহকারে প্রেসক্রিপশনটি পকেটস্থ করে ডাক্তারবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ডাক্তারবাবু বললেন, 'শুনুন, আপনাকে প্রথমে দেখেই আমার গৌরবাবুর কথা মনে হয়েছিল।'

নিতাইবাবু থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'গৌরবাবু কে? তার সঙ্গে আমার কীসের মিল?'

'গৌরবাবুকে আপনি চিনবেন না', ডাক্তারবাবু অল্প গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনাদের দুজনার এক জায়গায় সাংঘাতিক মিল। দুজনার কেউই আমাকে ভিজিট দিতে চান না।'

দ্বিতীয় গল্পটি আরও মারাত্মক।

এ ক্ষেত্রেও নিতাইবাবু ডাক্তারকে ভিজিট না দিয়ে বেরোনোর মুখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, ডাক্তারবাবুর কথা শুনে। এবং যথারীতি নিতাইবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'গৌরবাবু কে?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'গৌরবাবুকে চিনতেন না? ওই যে মোড়ের দোতলা সাদা বাড়ি। গত সপ্তাহে হার্টফেল করে মারা গাছেন। আপনাকে দেখে সেই গৌরবাবুর কথা মনে পড়ছে।'

আঁতকে উঠলেন নিতাইবাবু, 'সে কী? আমারও হার্টফেল হওয়ার ভয় আছে নাকি?'

মুচকি হেসে ডাক্তাবাবু বললেন, 'না, না। আপনার হার্ট তো বেশ ভালই।'

নিতাইবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'তবে?'

'আসলে ব্যাপারটা হল এই যে,' ডাক্তারবাবু ব্যাখ্যা করলেন, 'ওই গৌরবাবুও আপনার মতোই ভিজিট দিতেন না কিনা, তাই আপনাকে দেখে গৌরবাবুর কথা মনে পড়ছে।'

এর বিপরীত দিকের ঘটনাটিও এবার বলতে হচ্ছে।

সনাতনবাবু একজন সচ্ছল ব্যক্তি। বাড়ি না থাকলেও তাঁর একটা গাড়ি আছে। কিন্তু তিনি কাছাকাছির মধ্যে পায়ে হাঁটাচলা করতেই ভালবাসেন।

বয়েস হয়েছে, একদিন হঠাৎ রাস্তায় কলার খোসায় পিছলে পড়ে গিয়ে সনাতনবাবুর পা মচকিয়ে গেল। হাঁটাচলা কঠিন হয়ে পড়ল।

পাড়ার ডাক্তারবাবু দেখলেন, মলম-মালিশ লাগানো হল, ওষুধ খেলেন কিন্তু পা ফোলা বা ব্যথা কিছুই কমল না।

অতঃপর সনাতনবাবু খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। অনেক কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করে, অনেক দেখে শুনে তারপর সনাতনবাবুকে শল্যচিকিৎসক বললেন, 'কিছু ভাববেন না। তিন মাসের মধ্যে এমন করে দেব যে আপনি রাস্তায় হাঁটতে পারবেন।'

সত্যিই তাই হয়েছে। সনাতনবাবু এখন হেঁটেই চলাফেরা করেন। শল্যচিকিৎসকের খরচ জোগাতে শখের গাড়িটি বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

পুনশ্চ:

রোগী: ডাক্তারবাবু সব অসুখই তো সারালেন, কিন্তু নিশ্বাসের কষ্টটা? আর কতদিন থাকবে?

ডাক্তারবাবু: একটু ধৈর্য ধরুন আপনার নিশ্বাস যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করছি।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য কথার নানা রকম অর্থ।

আমরা যখন বলি এই লোকটার স্বাস্থ্য ভাল এবং ওই লোকটার স্বাস্থ্য খারাপ; তখন আমরা বলতে চাই যে এই লোকটি গাট্টাগোট্টা, মোটাসোটা আর ওই লোকটা পাতলা মতন রোগা।

বৎসরান্তে আমরা ভাইয়েরা যখন মায়ের সঙ্গে মাতুলালয়ে যেতাম আমাদের মাতামহ আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে তাঁর কন্যাকে প্রশ্ন করতেন, 'বছর বছর তোমার আর তোমার ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো কর না।'

খাওয়াদাওয়ার কথা নয়। তখন আমাদের উঠতি বয়েস, দাদার বারো-চোদ্দো, আমার দুবছর কম। দৈনিক বারো ঘণ্টা ফুটবল, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, সাঁতার, আমাদের শরীরে মাংস লাগবে কী করে? আর মায়ের বয়েসই বা তখন কী এমন, বড় জোর ত্রিশ-বত্রিশ। একটা একান্নবর্তী গোলমেলে পরিবারের জোয়াল সারা বছর তাঁর কাঁধে, এর মধ্যে মারকাট করে, নানারকম বিধিবন্দোবস্ত করে বৎসরান্তে আমাদের পরীক্ষার পরে অগ্রহায়ণ মাসে এই দিন সাতেক পিত্রালয়ে যাওয়ার ছুটি।

স্মৃতিবেদনার কাহিনী লেখার অবকাশ এই তরল সাপ্তাহিক রচনায় নেই। তবু স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে আরেকটি প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে।

যাঁরা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের যুগে ইস্কুলে পড়েছেন, মানে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন তাঁদের হয়তো মনে আছে, ইস্কুলের নিচু ক্লাসে এই ফাইভ-সিক্স পর্যন্ত অথবা হয়তো প্রাইমারি পর্যায়ে ফোর পর্যন্ত স্বাস্থ্য একটি পাঠ্য বিষয় ছিল। বাংলা-ইংরেজি, ইতিহাস-ভূগোল, অঙ্কের মতোই 'স্বাস্থ্য' পড়ানো হত, পরীক্ষা হত।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা বলতে যা বোঝায় মোটেই তা নয়, এ পরীক্ষা অ্যানুয়াল ও হাফইয়ার্লি, কাগজেকলমে প্রশ্নোত্তর। তাতে গায়ে সাবান দেওয়া, দাঁত মাজা, ব্যায়াম করা, সুখাদ্য খাওয়া এমনকী মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া, কলেরা নিয়ে অধ্যায় ছিল। বালক-বালিকারা অল্প বয়েসেই এসব জেনে গেছে।

আজকাল বোধহয়, স্বাস্থ্য উঠে গেছে। তার জায়গায় এসেছে বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান এমনকী কিশোর-কিশোরীদের আলতোভাবে যৌনবিজ্ঞানের পাঠ দেওয়ার কথাও চলেছে। তবে স্বাস্থ্যের কথা আর শুনি না।

সে যা হোক, অভিধানগত স্বাস্থ্য কিংবা পাঠ্যতালিকার স্বাস্থ্য নয়, স্বাস্থ্য বলতে প্রকৃতই আমরা যা বুঝি এবার সেই প্রসঙ্গে যাই।

আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর অসুখ করে, স্বাস্থ্য খারাপ হয়, আমরা তখন ডাক্তারবাবুর কাছে যাই। ডাক্তারবাবু আমাদের পরীক্ষা করে দেখেন, তারপর ওষুধ দেন,

পথ্য দেন, কিছুদিন বিশ্রাম করতে নির্দেশ দেন। আগেকার দিনে বায়ু পরিবর্তন করতে বলতেন, লোকে দু-চার মাস পাহাড়-জঙ্গল বা সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসত।

সত্যি কথা বলতে কী ওষুধ পথ্য এসব নয় অধিকাংশ অসুখই সেরে যায় বিশ্রামে।

কিন্তু আমাদের এই ব্যস্ত নাগরিক জীবনে, যেখানে সকালে ঘুম থেকে উঠে বাজার করা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাস দিন শুরু হয়, তারপর নাকেমুখে ভাত গুঁজে অফিস, সেখানে দৌড়-ঝাঁপ, তারপর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়ের হোমটাস্ক থেকে অমিতাভ বচ্চনের ক্রোড়পতি—বিশ্রামের অবকাশ কোথায়।

আমার এক বন্ধু ভাল বুদ্ধি বার করেছেন। কলকাতার সবচেয়ে নাম করা ডাক্তারদের একজন থাকেন তাঁর বাড়ির পাশেই। সেখানেই চেম্বার, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেই চেম্বারে গাদাগাদি ভিড় হয়।

আমার বন্ধুটি অফিস থেকে ফিরে একটু দেরি করে সেই চেম্বারে গিয়ে নাম লেখান। সুপ্রশস্ত, আরামদায়ক ডাক্তারের প্রতীক্ষালয়, প্রচুর ইংরেজি-বাংলা ম্যাগাজিন। আরামে ও চমৎকার বিশ্রামের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। রাত দশটা-সাড়ে দশটাতেও যখন ডাক পড়ে না, তিনি উঠে কম্পাউন্ডারের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে বাড়ি ফিরে আসেন।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কিন্তু কেন?'

তিনি বলেছিলেন, 'বাড়িতে তো এক দণ্ড বিশ্রাম নেই। ওই কয়েক ঘণ্টা ডাক্তারের চেম্বারে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামে শরীর ঠিক হয়ে যায়। ডাক্তারের ফি লাগে না, ওষুধপত্রের ঝামেলা নেই।'

এ ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু সঙ্গে রোগীর দেখা হয় না।

যে ক্ষেত্রে দেখা হয়, তার ঘটনা একটা বলি।

বাজারে দেখেছিলাম, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পুরনো রোগীর দেখা, ডাক্তারবাবু সৌজন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন?'

প্রবীণ রোগী বললেন, 'তুমি শুনলে খুশি হবে না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'তার মানে।'

রোগী বললেন, 'তার মানে ভাল আছি।'

বিলিতি বিয়ার-পাব

বিয়ার-পাব মানে বিয়ার পানশালা। পাবলিক হাউস সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে পাব, ইংরেজিতে লেখা হয় pub।

পাব একান্তই বিলিতি ব্যাপার, ইংল্যান্ড দেশীয় কিংবা আরও গুটিয়ে এনে বলা যায় লন্ডন নগরীয়। মার্কিন দেশে ক্বচিৎ-কদাচিৎ দুয়েকটা বিয়ার-পাব দেখা যে যায় না তা নয় তবে সেগুলো প্রধান পানশালা নয়। আমাদের দেশে, কাছাকাছির মধ্যে ব্যাঙ্কক, হংকং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি মহানগরেও দুয়েকটা ইতস্তত বিয়ার-পাব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লন্ডনের বিয়ার-পাবের চরিত্র সেগুলোর মধ্যে নেই।

আগে এই কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় এবং মফস্বল শহরেও চায়ের স্টল ছিল। দক্ষিণ কলকাতায় সুতৃপ্তি, বনফুল, বিজলি গ্রিল ইত্যাদি চরিত্রবান সব রেস্তোরাঁ ছিল। সেগুলোর চেহারা, মালিক, খদ্দের, আড্ডার প্রকৃতি সবই বিশিষ্ট ছিল। একটা ঘরোয়া প্রকৃতি ছিল ওই দোকানগুলোর, একটা স্থানীয় চেহারা। স্বতন্ত্র চরিত্র।

দুঃখের বিষয় আমাদের যৌবনকালে এবং তারও বহু আগের পিতৃ-পিতৃব্যদের আমল থেকে এই যে বিশিষ্ট চায়ের দোকানগুলো ছিল এগুলো আজকাল আর নেই বললেই চলে। সবই প্রায় উঠে গেছে।

ব্রিটিশ পাব কিন্তু এখনও আছে, সেই রমরমা নেই, বহাল তবিয়তে না হলেও আছে। একেক পাড়া বা এলাকায় একটি কি দুটি নির্দিষ্ট পাব। তাদের খদ্দেররা বহু বহুকালের পুরনো। তাদের রুচি, মর্জি সবই পাব মালিকের নখদর্পণে, তাদের ব্যক্তিগত জীবন, সুখ-দুঃখ সবই পাব মালিক জানে। পাব হল কিছুটা ক্লাব, কিছুটা আড্ডা, কিছুটা বৈঠকখানা—পুরো ইংরেজিয়ানা, এর কোনও বিকল্প নেই। যেমন বিকল্প ছিল না আমাদের সুতৃপ্তি রেস্তোরাঁর কিংবা বসন্ত কেবিনের।

সে যা হোক, সম্প্রতি বিয়ার-পাবের কথা উঠেছে অন্য এক অকল্পনীয় দিক থেকে।

গ্রেট ট্রেন রবারির কথা মনে আছে? ও রকম দুঃসাহসিক ট্রেন ডাকাতি এর আগে আর হয়নি।

প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। উনিশশো তেষট্টি সালের এক রাতে গ্লাসগো থেকে লন্ডন যাচ্ছিল নাইট মেল ট্রেন। সেই ট্রেনে ডাকাতি হল সরকারি টাকা পঁচিশ লক্ষ পাউন্ড। এখন বোঝা যাবে না, কিন্তু আজকের হিসেব অনুযায়ী এ ছিল বিরাট টাকার অঙ্ক।

এই ট্রেন ডাকাতি নিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় সব সিনেমা হয়েছিল, লন্ডনে ও হলিউডে। আমাদের বলিউডেও অনেক পরে এই জাতীয় একটা ছবি হয়েছিল।

এই ট্রেন ডাকাতির পান্ডা, যাকে নায়ক করে এই সিনেমাগুলো করা হয়েছিল, সেই রনি বিগস ছিলেন যে কোনও কলকাতাইয়ার মতোই লন্ডনিয়া। ধীরে সুস্থে পাড়ার

পাবের শীতল অভ্যন্তরে প্রাচীন অগ্নিকুণ্ডের উষ্ণতায় সফেন বিয়ার মগে চুমুক দিতে দিতে এই ব্যক্তি ডাকাতির ছক কষেছিলেন।

সে ছক ব্যর্থ হয়নি। ডাকাতির বিপুল অর্থ করতলগত করে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যান, সেখানে ব্রাজিল দেশে বসবাস করেন রনি বিগস। কারণ সেখানে তিনি নিরাপদ, ব্রিটিশ সরকারের কোনও আবেদন বা নির্দেশের কোনও পাত্তা দেওয়া হয় না ব্রাজিলে।

রাজার হালে ব্রাজিলে জীবনযাপন করেছেন শ্রীযুক্ত রনি বিগস। কিন্তু এখন তিনি ক্লান্ত।

ব্রিটিশ প্রশাসন হাজার চেষ্টা করেও যাকে ধরতে পারেনি, যার কেশ স্পর্শ করতে পারেনি সেই রনি বিগস বলছেন, লন্ডনে ফিরে যেতে চাই।

সংবাদপত্রের লোকেরা জানতে চেয়েছে, 'ব্রাজিলে তো চমৎকার আছেন। আবার লন্ডনে ফিরে কী করবেন? সেখানে আপনি যাওয়া মাত্র আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।'

শ্রীযুক্ত বিগস বলেছেন, 'তা যাই হোক, আমি লন্ডন ফিরতে চাই।' শুধু একবার, মৃত্যুর আগে শুধু শেষবার লন্ডনে তাঁর প্রিয়তম পাবে বসে এক গেলাস বিয়ার—এই তাঁর শেষ বাসনা।

শেষ সংবাদ এই যে তিনি লন্ডনে ফিরে গেছেন এবং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। পুলিশ তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিয়ার-পাবে যেতে দেবে কি না, এখনই বলা কঠিন।

ভাগ্যফল

বিদ্যাও নয়, পৌরুষও নয় সর্বত্রই ভাগ্যম্ ফলতি। এই প্রায় অর্বাচীন সংস্কৃত শ্লোক অসফল মানুষদের বেশ মনের মতো কথা। কিন্তু তারা লড়ে, সারাজীবন ধরে লড়ে, ভাগ্যের হাতে চড় খেয়ে পড়ে গিয়েও আবার উঠে দাঁড়াতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত আবার দাঁড়ায়।

সত্যি কথা বলতে কি ভাগ্যে তথা জ্যোতিষে আমি বিশ্বাস করি না। মাদুলি, কবচ, রত্নধারণ ইত্যাদিতে আমার কোনও আস্থা নেই। আমার ডান হাতের অনামিকায় একটি মুক্তার আংটি রয়েছে বটে, কিন্তু সে আমার সিঁথির সিঁদুর, সধবার হাতের শাঁখা, বিবাহস্মারক। আজ সাঁইত্রিশ বছর আঙুলে রয়েছে, নট নড়ন-চড়ন, নট কিছু; একটু এদিক ওদিক হলে গৃহিণী কেলেঙ্কারি করে বসবেন। সেবার মুক্তো খুলে গিয়েছিল, স্যাকরার দোকানে আংটিটা সারাতে দিতে হয়েছিল, সেই সময়টা অনামিকায় একটা সুতো বেঁধে রাখতে হয়েছিল আংটির প্রতীক হিসেবে।

সে যা হোক ভাগ্য ও জ্যোতিষ নিয়ে আমি কিন্তু খুব বেশি একটা লেখার সুযোগ পাইনি। বছর বিশেক আগে 'কাণ্ডজ্ঞান'-এ এক কিস্তি জ্যোতিষ নিয়ে লিখেছিলাম, তার পরে কখনও কদাচিৎ একটুআধটু এদিকে ওদিকে।

আসলে সমস্যাটা খুবই অন্তর্নিহিত। বাংলা ভাষায় অধিকাংশ পত্রপত্রিকা জ্যোতিষ-জ্যোতিষী, রত্ন-মাদুলি ইত্যাদির বিজ্ঞাপনবাহী এবং এই সব বিজ্ঞাপনে তাদের যথেষ্টই আয় হয়। আমার যৎসামান্য ফাজিল রচনা এবং তার সামান্য কয়েকজন চপল এবং তরল পাঠক-পাঠিকার জন্যে এই সব বিজ্ঞাপনদাতাদের, কাগজওলারা চটাতে যাবেন কেন?

যদিও 'কাণ্ডজ্ঞান'-এ সাগরময় ঘোষ নির্দ্বিধায় আমার গোলমেলে রচনাটি ছেপে ছিলেন।

এই রচনাটির একটি খণ্ড ভগ্নাংশ, এবারকার ভাগ্যফলের আলোচ্য বিষয়।

বিষয় একটি বহু পুরনো গল্প। অনেকেই গল্পটা কখনও পড়েছেন কিংবা শুনেছেন।

তবু গল্পটা আরেকবার বলতে আমার আপত্তি নেই। কাণ্ডজ্ঞানে 'ভাগ্যফল' শিরোনামে জ্যোতিষ সংক্রান্ত রম্যনিবন্ধের শেষভাগে এই কাহিনীটি ছিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়।

যেমন সাধারণত ঘটে থাকে। রাজদরবারে এক জ্যোতিষী গিয়েছেন। প্রকাশ্য রাজসভায় তিনি জনে জনে সকলের হস্তরেখা বিচার করে চলেছেন।

জ্যোতিষী ব্যবসার যেটা চিরাচরিত কায়দা, প্রথমেই একটু আপদবিপদের কথা বলে ভয় দেখানো, তারপর তার প্রতিষেধক বাতলানো। এই প্রতিষেধক যথা মাদুলি, তাবিজ, রত্ন, মন্ত্রপূত জল বা বেলপাতা—এটাই জ্যোতিষী ঠাকুরের আয়ের উৎস।

তা সেদিন শেষ পর্যন্ত রাজার কাছে পৌঁছে, রাজার হাত দেখে জ্যোতিষী ফস করে বলে বসলেন, 'আপনার তো দেখছি বিশাল ফাঁড়া, তিনদিনের মধ্যে মৃত্যুযোগ রয়েছে।'

দুর্বল চিত্ত রাজা এই কথা শুনে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন, তাঁর মুখ অব্যবহৃত কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। রাজার অবস্থা দেখে পাশ থেকে তরুণ ও বিচক্ষণ সেনাপতি উঠে এসে জ্যোতিষ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জ্যোতিষীজি, রাজামশায় তো শুনলাম আর মাত্র তিনদিন বাঁচবেন। কিন্তু আপনি, আপনার পরমায়ু আর কতদিন?'

জ্যোতিষী নিশ্চিত মনে বলেন, 'সে আরও বিশ পঁচিশ বছর।' সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির হাতে তরবারি ঝলসিয়ে উঠল, জ্যোতিষীর কাটা মুণ্ডু রাজসভায় গড়িয়ে পড়ল।

রাজা 'এ কী হল, এ কী হল' বলে চিৎকার করে উঠলেন, সেনাপতি বললেন, 'হুজুর এই লোকটার কথা বিশ্বাস করে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। নিজের পরমায়ু কতটা তাই জানে না, এ বুজরুক অন্যে কতদিন বাঁচবে সেটা বলবে কী করে?'

কাণ্ডজ্ঞানের গল্পটা ছিল ঠিক এইরকম। কিন্তু খোদার ওপর খোদকারি তো অনবরত চলছে। সম্প্রতি এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে এই গল্পের শেষাংশটি একদম অন্যভাবে শোনালেন।

এ ক্ষেত্রে জ্যোতিষী একটু বেশি চালাক। সেনাপতি যেই 'আপনার পরমায়ু আর কতদিন?' জিজ্ঞাসা করলেন, জ্যোতিষী প্রমাদ গুনলেন। তারপর ভেবেচিন্তে বললেন, 'রাজামশায়ের পরমায়ুর সঙ্গে আমার পরমায়ু জড়িয়ে রয়েছে। আমি যেদিন মারা যাব রাজা তার পরের দিন মারা যাবেন।'

বলা বাহুল্য, অতঃপর সেনাপতির পক্ষে সম্ভব হয়নি জ্যোতিষীর গলা কেটে ফেলা।

ছবি

এই কিছুদিন যাবৎ নির্বাচন নিয়ে এত বেশি উত্তেজনা, মারামারি কাটাকাটি চলছে যে রক্তমাংসের মানুষজন নিয়ে কিছু লিখতে অস্বস্তি হচ্ছে।

সেই জন্যই ছবি নিয়ে লিখছি, তা নয়। ইংরেজি ৮ মে, বাংলা ২৫ বৈশাখ—এটা হল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, অর্থাৎ এই সপ্তাহ তাঁরই সপ্তাহ। এই প্রখর গ্রীষ্মেই মনে পড়ে তাঁকে। মনে মনে প্রশ্ন ওঠে 'তুমি কি কেবলই ছবি?'

আমরা জন্মেছিলাম ছবির স্বর্ণযুগে। গ্রেটা গার্বো থেকে গ্রেগরি পেক, বাংলা ছবির উমাশশী, কাননবালা, অশোককুমার, প্রমথেশ।

তখন ছবি বলতে বোঝাত সিনেমা। কলকাতায় একটা বনেদি সিনেমা হলের নামই ছিল 'ছবিঘর'। পার্টিশনের আগের পুরনো উত্তরবঙ্গের একটা শহরে, ঠাকুর গাঁ নাকি নীলফামারিতে একটা সিনেমা হলের নাম ছিল ছবি।

রেডিয়ো তখন ঘরে ঘরে ঢোকেনি, টিভিও বহুদূরে। বাঙালির প্রধান বিনোদন ছিল সিনেমা বা টকি বা ছবি। সন্ধ্যায় পাটি পেতে বসে পানের ডাবর থেকে পান নিয়ে মুখে ঢেলে একটু সুগন্ধী জর্দা কিংবা কর্পূর মাখা, চুয়াচন্দন সিক্ত দোক্তা চিবোতে চিবোতে মা পিসিরা সদ্য দেখা টকির গল্প করতেন।

বিকেলে খেলতে গিয়ে আমরা পালকি ঘোড়ার গাড়ির থেকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া নীল রঙের হ্যান্ডবিল কুড়িয়ে আনতাম। একটা উড়ন্ত হ্যান্ডবিল ধরার জন্য সে কী প্রাণান্ত প্রয়াস। একটা হ্যান্ডবিলের বক্তব্য এই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর পরেও সম্পূর্ণ মনে আছে, পপুলার সিনেমায় ছবি আসছে উমাশশী কাননবালা পাগল করেছে, পাগল করেছে রে পাগল করেছে।

নীল হলুদ ঘুড়ি বানানোর কাগজে লাল কালি, কালো কালি দিয়ে ছাপা হ্যান্ডবিল, উমাশশী, কাননবালা এবং পাগল বেশ বড় টাইপে।

কিছুটা দূরদর্শনের জের, কিছুটা বাংলা সিনেমার হাস্যকর অবস্থা এর জন্য দায়ি। একদল গাঁয়ে মানে না নিজে মোড়ল তথাকথিত প্রগতিশীল আধুনিক সিনেমাওয়ালা, তাদের বই দেখা যায় না। আরেকদল গুড়ের আড়তদার জাতীয় লোক 'বাবা কেন চাকর', 'মা কেন পকেটমার' এই ধরনের প্রশ্নবোধক সামাজিক ছবি করছে। এ সব বই কে দেখবে?

এখনকার বাংলা সিনেমা নিয়ে বলতে গেলে কখনও শেষ করা যাবে না। বরং 'ছায়াছবি; তুমি শুধু ছবি', এই ছবির কথা বলি।

একালে ছবির ব্যবহার কমে গেছে। আজকাল কেউ বোধহয় আর মেয়ের নাম ছবি রাখে না। শুধু মেয়ের নামই বা কেন, বাংলা ছবির চিরকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের একজন ছবি বিশ্বাস।

তখন আমরা কোনও একটি জায়গা সুন্দর বলতে গিয়ে বলতাম ছবির মতো দেখতে। ময়দানে চুনী গোস্বামী ভাল খেললে বলতাম ছবির মতো খেলা। কোনও আনন্দময় দিনের স্মৃতি মনের ফ্রেমে বাঁধানো থাকত ছবির মতো।

অবশেষে চিত্রপ্রদর্শনীর একটা বিখ্যাত ছবির কথা বলি। ছবিটা অনেকেই দেখেছেন।

আমার ছোট ভাই বিজন ছবিটা দেখে বলেছিল, 'ছবিটা দেখলেই আমার জিবে জল আসে।' 'কেন?' জানতে চাওয়ায় সে বলল, 'এত সুন্দর ওমলেটের ছবি।'

দুঃখের বিষয় ওটা কিন্তু ওমলেটের ছবি ছিল না, ওটা ছিল সূর্যোদয়ের ছবি। দিগন্তে সাদা মেঘের বিস্তার, তার মধ্যে হরিদ্রাভ সূর্য। খুব যত্ন নিয়ে আঁকা। বিজন বলার পর কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, সত্যিই তো ওমলেট এমনই দেখতে।

ওই ছবি নিয়ে আরেকটা সমস্যা হয়েছিল। প্রদর্শনীর মন্তব্যের খাতায় এক দর্শক লিখেছিলেন, 'ছবির নামকরণ ভুল হয়েছে। এটার নাম হবে সূর্যাস্ত, সূর্যোদয় নয়। আমি শিল্পীকে চিনি, সে জন্মেও সূর্যোদয় দেখেনি, ঘুম থেকে ওঠে বেলা এগারোটায়।'

পুনশ্চ:

আমাদের বাড়িতে সাত রাজার ধন এক মানিক একটি যামিনী রায়ের অরিজিন্যাল আছে। সেদিন একটি বাচ্চা ছেলে ছবিটি দেখে বলল, 'নকল ছবি, ক্যালেন্ডার থেকে টুকেছে।'

পতন ও মূর্ছা

পুরনো দিনের যাত্রা-থিয়েটারের বই, যাকে বলা হত পালার বই, যাঁরা দেখেছেন তাঁদের হয়তো মনে আছে নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য, সাধারণত দৃশ্যের শেষে নাটক যখন তুঙ্গে সেই সময়ে ব্র্যাকেটে লেখা থাকত পতন ও মূর্ছা। ঘটনার গুরুভার বইতে না পেরে নাটকের একটি চরিত্র মূর্ছা যেত।

নাটক-থিয়েটার নয়। আমরা সাম্প্রতিক একটা সংবাদের নিকটে যাচ্ছি।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সুপ্রাচীন প্রসূতিসদন ইডেন হাসপাতালে কয়েকদিন আগে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।

হাসপাতালের ওয়ার্ডের তিনতলার জানলা দিয়ে এক তরুণী জননী তাঁর শিশুকন্যা (একদিন বয়েসি) নীচে ফেলে দিয়েছিলেন।

এ ঘটনার কার্যকারণ, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে যাওয়ার সুযোগ নেই 'কি খবর' নামক এই তরল রচনায়। মূল ঘটনাই এখানে যথেষ্ট।

শিশুকন্যাটিকে তার মা তিনতলার জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন মেরে ফেলবার জন্যে, কিন্তু সে মরেনি। একটি গাছের ডালে কন্যাটি পাতার মধ্যে অক্ষত অবস্থায় কাঁথা মোড়া অবস্থায় ঘুমাচ্ছিল, তার গায়ে আঁচড়টি লাগেনি।

আগেকার দিনে একেই বলত, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?' সব সময়ে কৃষ্ণ কিন্তু রাখেন না। এক রাজমিস্ত্রি ছাদের ভারা থেকে নীচে পড়ে যায়। তার কিন্তু বিশেষ কিছুই হয়নি। নীচ দিয়ে এক বৃদ্ধ যাচ্ছিলেন, রাজমিস্ত্রি সেই বৃদ্ধের ঘাড়ে পড়ে, বৃদ্ধটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

বৃদ্ধের ছেলে আদালতে নালিশ করেন, সেখানে বিচারে রাজমিস্ত্রি বেকসুর খালাস পায়। কারণ মিস্ত্রি নিজে ইচ্ছে করে পা পিছলিয়ে পড়েনি, আর সে নিজেও মরতে পারত।

পিতৃহীন পুত্র কিন্তু একথা মানল না। সে ওপরের আদালতে গেল। তখন নবাবি আমল। কাজির বিচারের যুগ। পুত্রের অভিযোগ শুনে কাজি নির্দেশ দিলেন ভারার যেখান থেকে রাজমিস্ত্রি বৃদ্ধের মাথায় পড়েছিল সেখান থেকে বৃদ্ধের পুত্র লাফাবে আর বৃদ্ধ যেখানে ছিলেন সেইখানে রাজমিস্ত্রি দাঁড়াবে। পুত্র রাজমিস্ত্রির মাথায় পড়লে শোধবোধ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, পুত্র মাচায় উঠে রাজমিস্ত্রির মাথায় লাফিয়ে পড়ার সাহস করেনি।

নির্মীয়মাণ অট্টালিকা থেকে রাজমিস্ত্রির নীচে পড়ে যাওয়ার ঘটনা খুব বিরল নয়।

এ বিষয়ে ইংরেজিতে একটা আলোচনা করেছিলাম। যদি সহসা কোনও মিস্ত্রি তার ভারা থেকে রাস্তায় পথচারীর ঘাড়ে পড়ে, সে ঘটনা হল দৈবাৎ। মানে অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু সে যদি একই পথচারীর কাঁধে ওই ভারা থেকে আরেকদিন পড়ে তা হলে সেটা হবে

দুর্লভ যোগাযোগ বা কোয়েনসিডেন্স (Coincidence)। কিন্তু এরপরেও আছে। ওই একই ব্যক্তির ঘাড়ে যদি ওই একই রাজমিস্ত্রি এরপরেও পড়ে, তিনবার, চারবার কিংবা আরও বহুবার তখন আর সেটাকে দৈবাৎ বা দুর্লভ বলা যাবে না তখন সেটা নিছক হ্যাবিট, অভ্যেস।

এবার দুটো পড়ে যাওয়ার ঘটনা বলি।

সিনেমা হলের ব্যালকনির রেলিং ভেঙে এক ভদ্রলোক হলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। হলের মালিকেরা দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে আপসে ব্যাপারটা মিটমাট করে নেন। কিন্তু সেই দর্শক এতে সন্তুষ্ট হননি। তাঁর বক্তব্য, পড়ে যাওয়ার সময় তিনি সিনেমার অর্ধেকটা দেখেছিলেন।

সুতরাং ক্ষতিপূরণের ওপরেও টিকিটের দামের অর্ধেকটা তিনি ফেরতও পাবেন। শুনেছি, হলওয়ালা টিকিটের দামের অর্ধেক সাড়ে বারো টাকা তাঁকে ফেরত দিয়েছিলেন। সিনেমা হল থেকে হোটেলে যাই।

হোটেলের কাউন্টারে থ্যাঁতা নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে মাথায় এলোমেলো চুলে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে খালি গায়ে, লুঙ্গি পরা এক ভদ্রলোক হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে এসে তিনতলার বত্রিশ নম্বর ঘরের চাবি চাইলেন।

রিসেপশন কেরানি বললেন, 'বত্রিশ নম্বর ঘরে চ্যাটার্জিবাবু থাকে। তার কাছে আপনার কী দরকার?'

সেই রক্তাক্ত ব্যক্তি বললেন, 'আমিই চ্যাটার্জিবাবু। আপনাদের তিনতলার বারান্দা থেকে এইমাত্র পড়ে গিয়াছিলাম।'

রাজনীতি

রাজনীতি নিয়ে আমি সাধারণত কিছু লিখি না, বিষয়টি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলি।

কিন্তু ঘাড়ের ওপরে একটা নির্বাচনের গরম নিশ্বাস মুহুর্মুহু পড়ছে। খবরের কাগজ, দূরদর্শন সব কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে। কীসে কী হচ্ছে, কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

আর রাজনীতির কুশীলবেরা অনেকেই এমন সব আচরণ করছেন, মুখ ফসকিয়ে কিংবা কিছু না ভেবে এমন সব কথা বলছেন, যার কোনও মানে হয় না। আর টেনেটুনে মানে বার করলে সে খুবই বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে।

নিজের প্রচার করতে গিয়ে বিপক্ষের অহেতুক নিন্দেমন্দ করা কিংবা বিপক্ষকে গালিগালাজ করা নিশ্চয় অশালীন এবং অনৈতিক কাজ। সাধারণ নাগরিক এগুলো যে বিশেষ পছন্দ করেন তাও নয়। কিন্তু চলছে, চলবে।

এমন অনেক রাজনৈতিক বক্তা আছেন যাঁরা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে অক্লান্তভাবে, ভগ্ন কণ্ঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করে যেতে পারেন।

একবার বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে পার্কের একপাশে একটি জনসভার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখি বক্তা ভদ্রলোক বলে যাচ্ছেন তো বলেই যাচ্ছেন। সেটা অবশ্য নির্বাচনের সময় ছিল না। ভদ্রলোক রাজনৈতিক কোনও বিষয়ে বলছিলেন। মধ্যে মধ্যেই শুনছিলাম, 'ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে', 'জাতির এহেন পরম দুর্দিনে', 'চতুর্দিকে চক্রান্তের বেড়াজাল' এইরকম সব মার্কামারা পংক্তি।

পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই বক্তা কতক্ষণ বলছেন?' উদাসীন প্রকৃতির ভদ্রলোক আলগোছে বললেন, 'তা, প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বিষয়ে বলছেন?' ভদ্রলোক চিনেবাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, 'তা বলতে পারব না। উনি এখনও খোলসা করে কিছু বলেননি।'

নির্বাচনী বক্তৃতায় কিন্তু খোলসা না করে বলে কোনও উপায় নেই। সে বক্তৃতা অধরা, অছোঁয়া হলে চলবে না। মোদ্দা কথাটি বলতেই হবে, 'আমরা ভাল। আমাদের ভোট দাও। ওরা খারাপ, ওদের ভোট দিয়ো না।' খুব বেশি রাখ-ঢাক না করে এ কথাও বলতে হয়, 'আমরা ভাল, তবু যদি আমাদের ভোট না দেন, তা হলে টের পাবেন আমরা কত খারাপ।'

নির্বাচন প্রার্থীকে সামনে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সেই সাবেকি পদযাত্রা 'ভোট ফর', 'ভোট ফর'। মুখে গদগদ হাসি, জোড়কর, বিনয়-বিহ্বল, ভদ্রতার জেরক্স কপি মাননীয় প্রার্থী পাড়ার মধ্যে ঘুরছেন।

বড় রাস্তায় বড় মিছিল। মোটর গাড়ি, জিপ, এসকর্ট কার, মোটর সাইকেল বাহিনী, সাইকেল মিছিল, আগে-পিছে লরিতে মাইক-ফেস্টুন-পতাকা—সে সমস্তই লোক

দেখানো, খবরের কাগজ আর দূরদর্শনকে চমক দেওয়ার জন্যে। না হলে, এই চলমান জনতার মধ্যে, এই চৌমাথায়, বাজারে, রাজপথে কজনাই বা এলাকার ভোটার।

সুতরাং হাতজোড় করে গলির মধ্যে ঢুকতেই হয়। বউদির লাল চা। মাসিমার চিনি কম, নুন বেশি লেবুর সরবত। বড়মার সজনেডাঁটা-চচ্চড়ি খেতে খেতে নির্বাচন প্রার্থী গলির মধ্যে চলেছেন।

কোথাও কোনও বাড়ির একটা ভাল বাইরের ঘর পেলে কিংবা সামনে একটু উঠোন পেলে, কিংবা ছোটখাটো জমি পেলে প্রার্থী মহোদয়, একটা সভা সেরে নিচ্ছেন। একে বলে ঘরোয়া আলোচনা বা পথসভা।

শহরতলির একটা এলাকার কথা বলছি। পাশাপাশি দুটো প্রায় একই রকম বাড়ি। একটি বৃদ্ধাবাস, অন্যটি মানসিক হাসপাতাল।

ভুল করে দলবলসহ ভোট প্রার্থী উন্মাদ আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। সেখানে উত্তেজনার কোনও অভাব হল না। প্রায় সকলেই 'ভোটের লোক এসে গেছে। আসুন, আসুন,' ইত্যাদি বলে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

এমনিতেই নির্বাচনের বাজারে সাধারণ মানুষেরই কেমন একটা খ্যাপা-খ্যাপা ভাব। এরা যে পাগল, ও বাড়িটা যে পাগলগারদ সেটা ভোটের লোকেরা টের পেল না। বাড়ির পিছনে এক চিলতে উঠোন, সেখানে বৈশাখের প্রথম রৌদ্রে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন, মুহুর্মুহু হাততালি পড়তে লাগল। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা চলল। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর্যায়ে বক্তা লক্ষ করলেন দু ব্যক্তি একটু আলাদাভাবে দূরে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। বক্তৃতা শুনে হাততালি-টাততালি কিছুই দেয়নি। বক্তৃতা শেষে নির্বাচন প্রার্থী সেই দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল, আপনারা আলাদা কেন?'

তারা বলল, 'আমরা কি পাগল যে ভোটের বক্তৃতা শুনে হাততালি দেব। এটা পাগলাগারদ। আমরা এখানকার কর্মচারী। আপনার কথা শুনে যারা লাফালাফি করছে, হাততালি দিয়েছে তারা সবাই এখানকার পাগল।'

চপলতা

আসুন এবার একটু চপলতা করা যাক।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, সারা বছর ধরে চপলতাই তো করে থাকেন, এ আর নতুন কথা কী?

অভিযোগ নতমস্তকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একে বৈশাখের দাবদাহ, দগ্ধ তাম্র দিন চারদিক জ্বলেপুড়ে ছারখার তার সঙ্গে নির্বাচনী মহারণ, চাপান-উতোর, উতোর-চাপান, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, হাতাহাতি এমনকী রক্তপাত, মৃত্যু। সাধারণ, নির্বিবাদী মানুষের পক্ষে অসহ্য, অসহ্য, অসহ্য। কিন্তু বলার কেউ নেই, 'থামুন। এই রক্তরঙ্গ থামান। এই উত্তেজনা থামান। আমরা আপনাদেরই লোক। আমরা আপনাদেরই ভোট দেব। আমরা আপনাদেরই ভোট দিয়েছি। আমাদের জন্যে এত হানাহানি করবেন না।'

চপলতা করতে গিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক আলোচনায় চলে এলাম। এ বাজারে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভোটের রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নেই।

এবং সেই জন্যেই একটু হালকা হওয়ার জন্য এবারে একটু অতি তরল চপলতায় যাই। আপনাদের উত্তেজিত স্নায়ু ও শিরাগুলি হালকা থেকে হয়তো একটু আরাম পাবে।

চাপল্যের কোনও দিনক্ষণ, বাঁধা মুহূর্ত নেই। স্থান-কাল, বয়েস নেই।

প্রবীণ বয়েসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কোনও এক নিরুপমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন,

চপলতা যদি আজ কিছু ঘটে,
করিয়ো ক্ষমা
হে নিরুপমা।

না। আমার তেমন কোনও নিরুপমা নেই যার সঙ্গে চপলতা করতে পারি।

শিবরাম চক্রবর্তীর অনুকরণে বলতে পারি আমার যে নিরুপমা ছিলেন তিনি ঝরিয়া চলে গেছেন। ওই রবীন্দ্রনাথই তো বলেছিলেন, 'ফাগুনের ফুল গেছে ঝরিয়া।'

এই ভৈরব, রুদ্র, বৈশাখে গত বসন্তের ফাগুনের ফুলের কথা থাক বরং দুয়েকটা লোকায়ত গল্প বলি।

প্রথম গল্পটা পিতা-পুত্রের।

ছেলে এসে বাবাকে বলেছে, 'বাবা আমাকে পাঁচটা টাকা দেবে?'

বাবা বললেন, 'জানো তোমার বয়েসে আমরা টাকার কথা ভাবতেই পারতাম না, আমরা বাবার কাছে টাকা চাইতাম না, পয়সা চাইতাম।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ছেলে বলল, 'ঠিক আছে। তোমার কথাই থাক। তুমি আমাকে পাঁচশো পয়সা দাও।'

দ্বিতীয় গল্প প্রেমিক-প্রেমিকার।

বিকেলে প্রেমিক এসে তার প্রেমিকাকে বলল, 'আজ সন্ধ্যাবেলা দারুণ জমবে।'

প্রেমিকা বলল, 'কী করে জমবে? আমাকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।'

প্রেমিক বলল, 'আরে এই দেখো না, আজ সন্ধ্যা ছটা-নটার শোয়ে 'ঘর জামাই এম এল এ চাই' সিনেমার তিনটে টিকিট কিনে এনেছি।'

বিভ্রান্ত প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের দুজনের জন্যে তিনটে টিকিট কেন?'

প্রেমিক বলল, 'আরে ওই টিকিটগুলো কি আমাদের জন্যে নাকি। ওগুলো তোমার বাবা, মা, ছোটভাইয়ের জন্যে।'

অবশেষে রাজনীতি দিয়ে শেষ করি।

এক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি এমন কী করতে পারেন, যা অন্যে পারে না।'

প্রবীণ রাজনীতিবিদ মধুর হেসে আমাকে বলেছিলেন, 'আমি আমার নিজের হাতের লেখা পড়তে পারি, যা অন্য কেউ পারে না। হাজার চেষ্টা করেও পারে না।'

অবাস্তব

রস ও রহস্যের রচনায় অবাস্তবতার একটু ছোঁয়া প্রয়োজন পড়ে। পুরোপুরি সত্যি ঘটনা গল্প হিসেবে তেমন জমে না। মজা থাকে ঘটনার আড়ালে-আবডালে।

তবে বাস্তবমুখী বা বাস্তববাদী গল্প বা উপন্যাস বলতে সাধারণত যা চোখে পড়ে তার অধিকাংশই রাজনৈতিক কিচির-মিচির অথবা বেলেল্লাসিদ্ধ যৌনতা।

সাপ্তাহিক এই রচনায়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জন্য নির্দিষ্ট, নিষ্কলুষ এই কলমে ওসব আমার দ্বারা হয়নি, হবে না। শুধু রুচিতে নয়, বোধেও আটকাবে।

সুতরাং রসরচনার অবাস্তব জগতে পুনঃপ্রবেশ করতে হচ্ছে। সাপ্তাহিক দায় মেটাতেই হবে।

প্রথম গল্পটি অবাস্তবতার ধার ঘেঁষে, কাহিনীটি সম্পূর্ণ সত্যি না হলেও বিশ্বাসযোগ্য।

বিখ্যাত ফুটবল কোচ প্রদোষ বসু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন একজন বলবান ব্যক্তি এক খুবই কাহিল ও রুগণ চেহারার লোককে বেধড়ক পেটাচ্ছে।

বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও প্রদোষবাবু দুবেলা মাঠে নামেন। দৌড়ঝাঁপ করেন, তা ছাড়া ক্যারাটে জানেন, নিয়মিত ব্যায়াম করেন। সর্বোপরি প্রদোষবাবু অত্যন্ত ভালমানুষ অথচ রগচটা। তিনি চোখের সামনে দুর্বলের ওপর সবলের ওই অত্যাচার দেখে আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলেন না। দৌড়ে গিয়ে একটা শক্ত পেনালটি কিকে প্রবল ব্যক্তিটিকে ধরাশায়ী করে ফেললেন।

হঠাৎ এই আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সবল ব্যক্তিটি ফুটপাথ থেকে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে কোনও দিকে না তাকিয়ে রাস্তা পার হয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

প্রহৃত ব্যক্তিটি, কিছুই হয়নি এমনভাবে দাঁত বার করে হেলতে হেলতে বলল, 'ফিফটি-ফিফটি।' এই বলে টাইট গেঞ্জির অভ্যন্তর থেকে একটা মানিব্যাগ বার করে প্রদোষবাবুকে দিয়ে বলল, 'এর থেকে অর্ধেক রাখুন, আপনার শেয়ার।'

আসলে এই ব্যক্তিটি পকেটমার। প্রথম ব্যক্তিটির মানিব্যাগ সে তুলে নিয়েছিল। সেই অবস্থায় ধরা পড়ে তুমুল মার খেয়েও মানিব্যাগটা রক্ষা করে যাচ্ছিল। প্রদোষবাবু তাকে বাঁচিয়েছেন সেই জন্যে সে তার আয়ের অর্ধেক প্রদোষবাবুকে দিতে চায়।

হতভম্ব প্রদোষবাবু কী করবেন স্থির করতে না পেরে একটি বাইসাইকেল কিক করে সেই পকেটমারকে তাঁর মাথার ওপর দিয়ে পাশের গলির মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

একটা 'কোঁক' শব্দ হল। প্রদোষবাবু আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আবার কী ঝামেলা হয় কে জানে।

অতঃপর একটি অবাস্তব ঝামেলার উদাহরণে যেতে পারি।

ক্লাবের ছেলেরা পিকনিকে যাবে। বিশাল বড় বাস ভাড়া করে আনা হয়েছে। ছেলেরা লাইন দিয়ে সেই বাসে উঠছে।

ক্লাবের সেক্রেটারি জীবনলাল তদারকি করছে। জীবনলালের কাছে পিকু গেল, 'জীবনদা আমাকে বাসে উঠতে দিচ্ছে না।'

জীবনলাল বলল, 'কেন দেবে না? তুমি গিয়ে লাইনের পিছনে দাঁড়াও।'

পিকু বলল, 'তাই তো এতক্ষণ চেষ্টা করছি। যাই আবার দেখি।' সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে এলে জীবনলাল বলল, 'কী হল পিকু?'

পিকু বলল, 'ভীষণ ঝামেলা জীবনদা। সব সময়েই দেখছি, লাইনের পিছনে একজন না একজন দাঁড়িয়ে আছে।'

পুনশ্চ:

অনেকদিন গঙ্গারামের কথা বলা হয়নি। ইলেকশনের বাজারে গঙ্গারামকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

আজ 'অবাস্তব' লিখতে গিয়ে আবার সেই গঙ্গারামকে মনে পড়ছে। তার চেয়ে অবাস্তব আর কে আছে? গঙ্গারামের একটা কাহিনী বলি।

গঙ্গারামের অফিসে এক চঞ্চলা রমণী কাজ করেন। তিনি বিবাহিতা। কিন্তু চালচলন ভারী গোলমেলে। সম্প্রতি তিনি একটি পুত্রসন্তানের জননী হয়েছেন।

গঙ্গারামের সঙ্গে মহিলার গলায় গলায় ভাব। গঙ্গারামকে তিনি গোপনে বলেছেন, 'বাচ্চাটা হওয়ার পর থেকে আমার স্বামীকে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

গঙ্গারাম জানতে চায়, 'সে কী? কীসের সন্দেহ?'

মহিলা বললেন, 'আমার কেমন সন্দেহ হয় আমার এই ছেলে আমার স্বামীর নয়।'

(সম্পাদক মহাশয়,
শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করলাম না তো?)

বাগ্বিধি

বাক্+বিধি=বাগ্বিধি

সোজাসুজি বলা যায় কথা বলার নিয়ম। কিন্তু কথা বলার সত্যিই কি কোনও নিয়ম আছে? কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা কি সম্ভব?

সংস্কৃত শ্লোককার বলেছিলেন, শত কথা বলো কিন্তু কিছু লিখো না। লিখলে রেকর্ড থাকে, স্থিতধী শ্লোককার তাই না লিখে শতং বদ পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু কথা বলার বিপদও কিছু কম নয়, বিশেষ করে বেশি কথা বলার বিপদ কিছু বেশি। আমার গুরুদেব শিবরাম একবার গল্প লিখেছিলেন, 'শিব্রাম চক্রবর্তীর মত কথা বলার বিপদ'। সেই ভয়াবহ জটিলতায় আমরা যেতে চাই না।

তবে এ কথা বলব যে লেখার চেয়ে কখনও কখনও কথা বলাও কম বিপজ্জনক নয়।

লেখা তবু পরে কাটাকুটি করা চলে, সংশোধন করা চলে, তেমন ক্ষেত্রে ছিঁড়ে ফেলাও যায়। কিন্তু কথা তো ফেরত নেওয়া যায় না। টিউব থেকে বেরোনো টুথপেস্টের মতো মুখ থেকে বেরোনো কথা আর টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না, বেশি চেষ্টা করলে পেস্ট আরও ছড়িয়ে পড়ে।

সম্প্রতি ভোটের রণাঙ্গনে খ্যাতনাম্নী চিত্রতারকা শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায় দূরদর্শনে একটি অনর্থক উক্তি করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, যতবার তিনি তাঁর প্রথম উক্তি ব্যাখ্যা করতে যান ততই জট আরও বেড়ে যায়। যাই হোক, নির্বাচনে হেরে তিনি আপাতত সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

অহেতুক কথা বলার বিপদ যথেষ্টই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আজকাল তরুণী মাত্রেই সুরভিতা। দেশি-বিদেশি নানারকমের পারফিউমে এদের আসক্তি। উৎসব-অনুষ্ঠানে শুধু নয়, রাস্তা-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, অফিস-কাছারিতেও এঁরা সৌরভ বিস্তার করেন।

এইরকম এক আধুনিকা তরুণী বাসে যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশের সিটে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। তিনি এই তরুণীর সুগন্ধে বিমোহিত হয়ে গেলেন। এ রকম সুগন্ধি পারফিউম কোথায় পাওয়া যায়, কে জানে?

শেষপর্যন্ত কৌতূহল দমন করতে না পেরে ভদ্রলোক পার্শ্ববর্তিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনি যে পারফিউমটা ব্যবহার করেছেন, ওটার নামটা বলবেন।'

তরুণীটি প্রসাধনীটির নাম বলল, কোন দোকানে পাওয়া যাবে সেটাও বলল, তারপর প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আপনি কী জন্যে কিনবেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার স্ত্রীকে একটা উপহার দেব ভাবছি।'

তরুণীটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'সর্বনাশ! ও কাজ করতে যাবেন না। তা হলে রাস্তাঘাটে আজেবাজে লোক আপনার স্ত্রীর কাছে জানতে চাইবে, কী পারফিউম, কোথায় পাওয়া যায় এইসব কথা।'

বলা বাহুল্য এই ভদ্রলোক এর পরে অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন।

সাবধান হয়ে কথা না বলার বিপদ মৌখিক পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি, সেখানেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।

ডাক্তারির মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষক ছাত্রকে মুমূর্ষু রোগীর ওষুধ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন। প্রয়োজনীয় ওষুধটির নাম ছাত্রটি ঠিকই বলল। এবার অধ্যাপক ওষুধের পরিমাণ জানতে চাইলেন। ছাত্রটির আত্মপ্রত্যয় এসে গেছে, সে চট করে বলে বসল, 'দশ গ্রেইন।'

বলার পরে পরীক্ষকের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল উত্তর ভুল হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'স্যার দশ গ্রেইন নয় ওষুধের পরিমাণ পাঁচ গ্রেইন হবে।'

নির্বিকার অধ্যাপক বললেন, 'আর কোনও উপায় নেই। রোগী এক মিনিট আগে মরে গেছে। সামনের বছর আবার এসো।'

পুনশ্চ:

বেশি কথা বলার বিপদ

আদালতের কাঠগড়ায় চুরির মামলার আসামি দাঁড়িয়ে, দুই পক্ষের উকিলের বক্তব্য সাক্ষীদের জবানবন্দি ইত্যাদি সব শেষ, এবার হাকিম সাহেব আসামিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই চিরাচরিত প্রশ্ন:

হাকিম: আপনি দোষী না নির্দোষ।

আসামী: নির্দোষ। হুজুর আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

একবার নথিপত্রে খুব ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাকিম সাহেব আসামিকে বললেন, 'আপনি এর আগে কখনও জেল খেটেছেন?' প্রশ্ন শুনে আসামি করজোড়ে বলল, 'না স্যার। কখনওই না। এর আগে কখনওই আমি চুরি করিনি।' আসামির বক্তব্যের বিপজ্জনক এই শেষ পংক্তিটি বলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই স্বীকারোক্তির জন্যেই এবার জেল খাটতে হল তাকে।

নরবানর

সম্প্রতি দিল্লিতে নরবানর নিয়ে খুব হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়েছে।

পূর্বদিল্লি রীতিমতো আতঙ্কিত। লোকে দিনের পর দিন নরবানরের ভয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছে।

নরবানর রাতের অন্ধকারে আসে। তার উপস্থিতি টের পেলেই জনসাধারণ পাগলের মতো ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়।

গ্রীষ্মের এই সময়টায় দিল্লিসহ উত্তর ভারতের মানুষেরা সাধারণত ঘরের মধ্যে শোয় না। তারা ছাদে কিংবা উঠোনে ঘুমোয়।

গভীর রাতে, সাধারণত শেষরাতের দিকে মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচৈতন্য, নরবানরের আবির্ভাব হয়। ঘুমের ঘোরে কেউ হঠাৎ দেখতে পায়, বেঁটে মতন, চার ফুট উচ্চতা, লোমশ কালো শরীর, হ্রস্বকায় মানুষের মতো কিন্তু মুখ বানরের।

অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন ওই জীবটি মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে তার ক্ষণিক উপস্থিতিতে ভীত, আতঙ্কিত মানুষ ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। ঘুম চোখে অন্ধকারে পড়ে গিয়ে আহত হয়, দুজন তো মারাই গেছে। নরবানরের ভয়ে দিশেহারা হয়ে একজন রাতের অন্ধকারে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেছে। অন্য এক অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলা নিউ অশোকনগরে তার বাড়ির সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে মারা গেছে। আচমকা ঘুম থেকে উঠে ঘরের মধ্যে নরবানর দেখেই এই অবস্থা।

গত কয়েক রাত্রি নরবানর পূর্বদিল্লি এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল যমুনার এপারে নওদা পর্যন্ত এলাকা দাপিয়ে বেড়িয়েছে।

মুহুর্মুহু ফোন আসছে থানায়। পুলিশের কর্তারা টহল দিচ্ছেন, কোনও কূলকিনারা করতে পারছেন না। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি এই নরবানরের, লম্ফঝম্ফ অসাধারণ। রাত-পাহারায় যুক্ত আছেন দিল্লির এমন এক উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা বলেছেন, 'মুহূর্তের মধ্যে এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় উধাও হয়ে যাচ্ছে, বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ছে, এ রকম মানুষের কথা কল্পনা করতেও পারছি না।'

অথচ প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব নেই। অনেকেই স্বচক্ষে তাকে দেখেছে, দু-একজন তার সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি করেছে, আহত হয়ে হাসপাতালে গেছে কিন্তু তার গায়ে বানরের বা অন্য কোনও জীবের নখের আঁচড় কিংবা দাঁতের কামড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

অনেকেই মনে করছেন পুরো ব্যাপারটা কাল্পনিক যেমন কাল্পনিক ইয়েতি নামক বরফদৈত্য। গণ আতঙ্কের মানসিকতা অনেক সময় এ রকম আবছা জীবের জন্ম দেয়।

কিন্তু অনেকে, এমনকী পুলিশ বিভাগের কর্তারাও কেউ কেউ বলছেন, 'এতটা কল্পনা নয়। তবে মনে হচ্ছে একসঙ্গে একাধিক নরবানরের আবির্ভাব হয়েছে।' আবার

বিজ্ঞানমনস্ক কেউ কেউ বলছে, 'এসব রোবটের কীর্তি। কেউ রিমোট কন্ট্রোলে রোবট চালাচ্ছে।'

এ বিষয়ে আরও খবর হয়তো সংবাদপত্রে পাওয়া যাবে কিংবা ঘটনাটা একদম উবে যাবে।

তা যাকগে, এ সুযোগে আমরা দুটো পুরনো নরবানরের গল্প মনে করতে পারি।

গভীর বনের মধ্যে এক বৃহৎ গাছের নীচে বানরদের কবিরাজ মশায় বসেন। একটি অনতিতরুণ বানর তাঁর কাছে দেখাতে গিয়েছে। তার উপসর্গ লোম পড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ আপাদমস্তক দেখে নাড়ি টিপে, জিব দেখে অত্যন্ত চিন্তিত মুখে কবিরাজ মশায় অনেক প্রশ্ন করলেন, তারপর বললেন, 'তোমার আর কোনও চিকিৎসা সম্ভব নয়। অল্পদিনের মধ্যে তোমার সমস্ত লোম পড়ে যাবে।'

সন্ত্রস্ত বানরটি বলল, 'তা হলে? কবিরাজ বললেন, 'তা হলে আর কী? এরপর কোমর সোজা হয়ে যাবে। দুপায়ে হাঁটতে শিখবে।'

ভীত বানরটি বলল, 'কী সাংঘাতিক!'

'আরও সাংঘাতিক', কবিরাজ বলল, 'এরপর তোমার লেজ খসে যাবে।'

বানরটি আঁতকে উঠে বলল, 'তখন?'

কবিরাজ বলল, 'তখন আর কী? তখন তুমি মানুষ হয়ে যাবে।'

বানর থেকে মানুষ হওয়ার এমন সহজ ব্যাখ্যা ডারউইন সাহেবও ভাবেননি। তবে বহু আগের একটা পুরনো কথা মনে পড়ছে।

ছেলে চিত্রকর হয়েছে। ছবি আঁকছে। গর্বিত বাবা বন্ধুকে নিয়ে এসে দেখালেন, 'এই দেখো, আমার ছেলে কেমন বানরের ছবি এঁকেছে।' ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল, 'না বাবা, এটা বানরের নয়, এটা তোমার ছবি।'

বক্তৃতা

বক্তৃতাবাজি করা কিছু লোকের বদ অভ্যেস। খাওয়ার টেবিলে, বসবার ঘরে, পার্কের বেঞ্চে তারা যে কোনও বিষয় নিয়ে চেঁচায়। এমনভাবে চেঁচায় যে যেন তারা মাঠে-ময়দানে হাজার লোকের সামনে বক্তৃতা করছে।

কথা বলা, বক্তৃতা করা কিছু লোকের পেশা। যেমন উকিল, অধ্যাপক, রাজনীতির লোক। ঘণ্টা দুয়েক ঠায় দাঁড়িয়ে বলে যাওয়া এদের পক্ষে কিছু নয়। শ্রোতাদের সম্পর্কে এঁরা নির্বিকার। খবরের কাগজ পড়ে জানা গেল সম্প্রতি ভয়াবহতম বক্তৃতাটি করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

বিখ্যাত দক্ষিণী পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, ঠিকঠাক, গোছগাছ করে নিবেদন করতে পারলে চাই কি সর্বজনমান্য গুইনেস বুক অফ রেকর্ডেও ঘটনাটি স্থান পাওয়া মোটেই আশ্চর্যের হবে না।

ঘটনা এই রকম। সংক্ষেপ করেই বলছি।

অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্নিনির্বাপন দপ্তর অর্থাৎ ফায়ার ব্রিগেডের নবনিযুক্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান ব্যাপার হল সহনশীলতা প্রদর্শন। যাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেন তাঁরা আগুন নেবানোর মতো কঠিন কাজে কতটা যোগ্য হবেন, কতটা সহনশীল হবেন তারই পরীক্ষা, এর নাম এনডুরান্স টেস্ট।

জুন মাসের প্রখর রৌদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা ওঠ-বোস করেছেন, লেফট-রাইট করেছেন, দৌড়েছেন, লাফ-ঝাঁপ করেছেন, যাকে বলা চলে জিব বেরিয়ে যাওয়া— শিক্ষার্থীদের সেই অবস্থা। কিন্তু তাঁরা কী করবেন। সহনশীলতার পরীক্ষায় উতরোতে হবে, না হলে চাকরি হবে না।

কোনও রকমে হাঁফাতে হাঁফাতে শিক্ষার্থীরা সহনশীলতার শেষ পর্বে পৌঁছেছিলেন এমন সময় মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় শিক্ষান্ত ভাষণ দিতে এলেন।

সেই শিক্ষান্ত ভাষণ এত দীর্ঘ হয়েছিল যে ভাবী দমকল কর্মচারীরা আর দাঁড়াতে পারলেন না। একে একে প্যারেডের উঠোনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে লাগলেন।

এ ধরনের এনডুরান্স টেস্টে আগেই বন্দোবস্ত থাকে, স্ট্রেচার এবং চিকিৎসক মাঠের পাশেই মজুত ছিল। যেমন যেমন একেকজন ধরাশায়ী হচ্ছেন, তাঁকে স্ট্রেচারে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মন্ত্রীমহোদয় কোনও দিকে না তাকিয়ে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। ঝলসানো রৌদ্রে তিনিও দরদর করে ঘামছেন। ফায়ার ব্রিগেডের কর্মকর্তারা ভয় পাচ্ছেন শেষে মাননীয় মন্ত্রীকেও না স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে হয়।

সুখবর এই যে সেটা প্রয়োজন পড়েনি। অজ্ঞান হওয়ার আগেই তিনি বক্তৃতা থামিয়েছিলেন।

মন্ত্রীদের ব্যাপারই আলাদা। আমরা বরং সাধারণ বক্তাদের গল্পে যাই।

বক্তৃতা সম্পর্কে এই দুটি ক্লাসিক কাহিনী পাঠক-পাঠিকা ইতিপূর্বে অবশ্যই শুনেছেন (কিংবা হয়তো আমার লেখাতেই পড়েছেন)। তবু আবার স্মরণ করতে আপত্তি কী?

দুটি গল্প প্রায় একই রকম:

[এক] জনৈক বক্তা অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করে চলেছেন, কোনওদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

অবশেষে তিনি থামলেন। অনেক রাত হয়েছে। সভাকক্ষ শূন্য, একজন লোকও নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল একেবারে পিছন দিকে এক ব্যক্তি গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। এতক্ষণ মন দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলেন বলে মনে হল।

বক্তা ভদ্রলোক মঞ্চ থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানালেন।

শ্রোতা বললেন, 'শুধু ধন্যবাদে হবে না। আমাকে বকশিশ দিতে হবে।'

বকশিশ? বক্তৃতা শোনার জন্যে বকশিশ? বক্তৃতাবাজির সুদীর্ঘ জীবনে এমন কথা আমাদের এই বক্তা কখনও শোনেননি। একটু থমকিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'বকশিস কেন?'

শ্রোতা এবার খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আমি বক্তৃতা শুনছিলাম না। আমি এই হলের দারোয়ান, আপনার জন্যে রাত জেগে বসে আছি।'

[দুই] এ গল্পের ভদ্রলোকও দুর্দান্ত বক্তৃতাবাজ। এই ভদ্রলোক যখন বক্তৃতা শেষ করলেন তখন মধ্যরাত পার হয়ে গেছে, রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে।

যে কোনও কারণেই হোক সভাকক্ষে তখনও দু-চারজন শ্রোতা রয়েছেন। মঞ্চ থেকে নামতে নামতে বক্তা ভদ্রলোক নিজের শূন্য কবজির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাতঘড়িটা সারাতে দিয়েছি। দেয়ালেও কোনও ঘড়ি নেই। একটু দেরি করে ফেললাম নাকি।'

পরবর্তী বক্তা মঞ্চে উঠতে উঠতে বললেন, 'ঘড়ি না থাক, দেয়ালে তো ক্যালেন্ডার ছিল মশায়। এখন আমাকে সভার পরের দিন বক্তৃতা করতে হচ্ছে।'

স্ত্রীরত্ন

জটিল বিষয় তাই আপাতত একটু ভূমিকা করে নিচ্ছি। অপরিচিত দুজায়গা থেকে দুটো টেলিফোন পেলাম গত রবিবার সকালে। সেটা ছিল নববর্ষের পরের সকাল। ভেবেছিলাম নববর্ষের শুভেচ্ছাবাহী কোনও অনুরক্ত পাঠকের ফোন।

কিন্তু তা নয়। সেদিনই সকালে 'কি খবর'-এ স্বামী ভ্রমে এক মহিলার চোর পেটানোর গল্প লিখেছিলাম। দুজনেই সেই গল্প পড়ে খুব উত্তেজিত, দুই টেলিফোনকারীই বললেন, এই মহিলাকে তাঁরা চেনেন এবং দুজনেই অনুরোধ করলেন ওই মহিলা সম্পর্কে অল্পবিস্তর যা জানি সব কলম খুলে লিখতে। দরকার হলে তাঁরা প্রচুর তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করতে পারবেন। তবে উভয়পক্ষকেই সাবধান থাকতে হবে, কারণ মহিলা ভীষণ জাঁহাবাজ।

আমি যে ও রকম কোনও মহিলাকে চিনি না, নিতান্ত বিলিতি জোক বুকের গল্প বাংলা করে, আমার আর দশটি লেখার মতোই নিতান্ত টুকলিফায়েড সেটা প্রকাশ করে ভদ্রমহোদয়দের আর বিব্রত করিনি। তবু পাঠক যখন চাইছেন, স্ত্রীর বিষয়টি একটু নাড়াচাড়া করা যাক।

প্রথমে স্বীকার করা ভাল, 'স্ত্রীরত্ন' এই নামে আমার একটি আলাদা আস্ত বই আছে। তা ছাড়া সেই বইয়ের আগে ও পরে, গত সপ্তাহের 'কি খবর' অবধি এখন পর্যন্ত যা লিখেছি তা একত্র করলে একটা ছোটখাটো মহাভারত হয়ে যাবে।

সে যা হোক এযাত্রা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করি।

প্রথমেই বলে রাখি আমার স্ত্রী মোটেই দজ্জাল নন, ডাকসাইটে নন; কোনও বিপজ্জনক আলোচনায় তাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া অনুচিত হবে।

জানেন, আমাদের বাড়িতে যত কিছু গুরুতর সিদ্ধান্ত যেমন কাশ্মীরে তৃতীয় কোনও পক্ষের মধ্যস্থতা মেনে নেওয়া উচিত কিনা, ব্যাঙ্কের সুদের হার বাড়ানো হবে কিনা, মাধ্যমিকে সংস্কৃত পড়ানো বাধ্যতামূলক করা সম্ভব কিনা এই সব বিষয়ে আমার কথাই চূড়ান্ত।

এর পরে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে আপনার স্ত্রীর কোনও মতামত নেই?

কেন মতামত থাকবে না? ছোট ছোট সব ব্যাপারে, যেমন ইলিশমাছ কেনা হবে কিনা, পাশের বাড়ির বিয়েতে শাড়ি দেব না বই দেব, সজনেডাঁটা সরষে দিয়ে হবে না তেতো দিয়ে এসব ব্যাপারে আমি কোনও কথা বলি না, সব সিদ্ধান্ত আমার স্ত্রী নিজেই নেন।

অধিকাংশ মানুষের স্ত্রীরত্নই সত্যি সত্যি যথেষ্ট বিপজ্জনক।

একদা আমার এক সহকর্মী আমাকে বলেন যে বউ কিছু চাইলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিই কিংবা বলি, দিয়ে দেব।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'কিন্তু কেন?'

সহকর্মী বলেছিলেন, 'এতে খরচ কম হয়। এরপরে রাগারাগি, তারপরে কান্নাকাটি, অবশেষে অনশন, সর্বশেষে বাপের বাড়ি, ধাপে ধাপে খরচা বেড়ে যায়।'

অবশ্য সকলের স্ত্রী যে একেবারেই অবুঝ তা নয়। শুনেছি জনৈকা স্ত্রীরত্ন তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, 'ওগো আমরা এরকমভাবে দুজনের সঙ্গে দুজনে ঝগড়া না করলেও তো পারি।'

স্থিতধী স্বামী ঝগড়া থামিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, 'তা হলে ঝগড়া করার আর কী পন্থা আছে, সেটা বল। চেষ্টা করে দেখা যাক।'

পুনশ্চ:

এক বিপত্নীক ভদ্রলোক এক বিবাহ-বিচ্ছিন্নাকে বিয়ে করেন। সেই প্রচুর পোড় খাওয়া মহিলার অধিকতর পোড় খাওয়া এক বান্ধবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোর বর তোকে আগের বউয়ের কথা বলে না?'

মহিলা বলেছিলেন, 'দু-একবার চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু আমি তখনই তাকে আমার আগামী স্বামী কেমন হবে সে বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছি।'

মশা ও লবণহ্রদ

ডোডো-তাতাইয়ের যুগ, মানে সত্তরের দশকের গোড়া থেকে মশা নিয়ে এ পর্যন্ত আমি কিছু কম লিখিনি। তাতে কোনও ফায়দা হয়নি। মশার অত্যাচার কমা দূরে থাক আরও বেড়ে গেছে। আগে দু-এক জায়গা, যেমন কেশনগর (অর্থাৎ কেষ্টনগর) মশার জন্য কুখ্যাত ছিল। অন্নদাশংকর তাঁর অবিস্মরণীয় ছড়ায় কেশনগরের মশাকে অমর করেছেন,

'মশায়,
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।'

ছোটবেলায় পূর্ববঙ্গের সুদূর টাঙাইল শহরে বড় হয়েছি। সেখানে মশা ছিল, ম্যালেরিয়া ছিল কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ, সেটা দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ছিল।

পরে কৈশোর বয়েসে কলকাতায় এসে এসপ্ল্যানেডে এবং পরে পারিবারিক বাসা কালীঘাটে সতেরো বছর কাটিয়েছি। শীত-গ্রীষ্মে-বর্ষায় কোনও মশা ছিল না। মশা ছিল বালিগঞ্জে-টালিগঞ্জে, মশা ছিল কাশীপুরে-দমদমে। সোজা কথা কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত আসল কলকাতায় সেকালে কোনও মশা ছিল না।

মশারিও দুর্লভ ছিল। ধর্মতলায় অনন্ত মল্লিকের দোকানে কিংবা বউবাজারের বা বড়বাজারের বিছানা পট্টিতে এবং চেতলার হাটে মফস্বলের লোকদের জন্য মশারি বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। কলকাতাতে বাতিকগ্রস্ত এবং/কিংবা শৌখিন কেউ কেউ মশারি ব্যবহার করতেন। আমরা ধর্মতলা থেকে দেশে যাওয়ার সময় মশারি কিনে নিয়ে যেতাম।

এখন তো আর শ্যামবাজার বা কালীঘাট বেছে লাভ নেই। সব জায়গাই এক রকম। একই রকম মশা।

সেই গত বছর শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে এক স্পষ্টবাদী কেয়ারটেকারের কথা লিখেছিলাম না? তাঁকে বারংবার স্মরণ করি।

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'দাদা, এখানে মশা কেমন?' দাদা অম্লানবদনে জবাব দিয়েছিলেন, 'মশা আর কেমন হবে? ছোট ছোট, কালো কালো, পাখা আছে, ওড়ার সময় গুনগুন করে গান গায়, সুযোগ পেলে কামড়ায়।'

আসলে সব জায়গার মশাই এ রকম। কৃষ্ণকায়, সংগীত ও দংশন প্রবণ। তবু, কয়েক বছর আগে সল্টলেকে এসে মনে হয়েছিল এখানে মশা একটু অন্যরকম। যতটা উড়ে উড়ে গান গায়, ততটা কামড়ায় না। আসলে সংখ্যায় ছিল খুব কম। নতুন জনপদ, নতুন বাড়িঘর ঠিকমতো দখল নিতে পারছিল না।

কিন্তু এখন আমরা মশার খাসতালুকের প্রজা। আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে

মশা। কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'রেতে মশা, দিনে মাছি'র কথা বলেছিলেন, সল্টলেকে এখন দিনেরেতে মশা। এতই মশা যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে উঠে মন্ত্রী বললেন, 'আগে মশা তাড়াও।' অন্য এক মঞ্চে দেখলাম ভি-আই-পিদের মিনারাল ওয়াটারের বোতলের সঙ্গে এক টিউব করে মশার মলম দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলছেন, মশা মারার তেল দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কম দামি তেল হওয়ার জন্যে তেলের জোর কম বলে মশার জোর বেড়েছে। স্থানীয় এক মাননীয় অধিবাসী বললেন, বাদুড় পুষলে উপকার পাওয়া যাবে, বাদুড় ঘণ্টায় অনেকগুলো করে মশা খায়। গঙ্গারাম শুনে বললে, একসঙ্গে অনেকগুলো বাদুড় যদি অনেকগুলো মশা খেতে থাকে তা হলে যে শব্দ উৎপন্ন হবে, সেটা ৬৫ ডেসিবেলের বেশি হবে।

এত সব শোনার পরেও আমি নিজে একটা বুদ্ধি বের করেছি। গত সপ্তাহে শ্রীনিকেতনে গ্রামীণ কবিতা উৎসবে গিয়েছিলাম। তিনদিন ছিলাম না। যাওয়ার দিন সকালবেলা উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার সময় অন্যান্য দিনের মতো মশারিটা তুলে দিলাম না, একটু এলোমেলো করে দিলাম, ঘরের আনাচে-কানাচে যেখানে যত মশা ছিল ছুটে এসে মশারির মধ্যে ঢুকে গেল। যখন দেখলাম বহু মশা ঢুকে গেছে, মশারিটা টান টান করে গুঁজে দিলাম। যেমন শোয়ার সময় গোঁজা হয়।

এরপর তিনদিন মশারির মধ্যে বন্দি ওই মশারা। ফিরে এসে যখন মশারি তুললাম, বহু মশা মৃত, অধিকাংশই জীবন্মৃত। তিনদিন অনাহারে থাকা ওইটুকু জীবের পক্ষে কম কঠিন নয়। জীবন্মৃতেরা কোনওরকমে মশারির নীচ থেকে বেরিয়ে চলে গেল। তারা আর ফেরেনি এবং তাদের মুখে এই দুর্বিপাকের কাহিনী শুনে অন্য মশারাও আমার ঘরে এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

রোগী ও ডাক্তার

রতনলাল?

বোধহয় রতনলালই নাম ছিল সেই ডাক্তারবাবুর। রতনলাল ডাক্তার।

পদবি কী মনে পড়ছে না। রতনলাল ডাক্তার নামেই তিনি বিখ্যাত ছিলেন। পুরনো আমলের অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ডাকসাইটে ডাক্তার ছিলেন তিনি, কলকাতায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পর্যন্ত তাঁকে জানতেন।

বিশাল পসার ছিল রতনডাক্তারের। রোগীর আগাপাছতলা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতেন। সেকালে তো আজকালকার মতো এক্স-রে রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি ছিল না। স্পেশালিস্ট ডাক্তারও প্রায় ছিল না, সাধারণ চিকিৎসককে সব দেখতে হত।

রতনলাল ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি টিপে দেখে, স্টেথসকোপ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃদ্‌যন্ত্র ইত্যাদির পরীক্ষা চালাতেন, টর্চ লাইটের আলো ফেলে নাক, কান, চোখ তন্নতন্ন করে দেখা হত কোথাও কোনও অসঙ্গতি আছে কিনা। পেট খামচে ধরে লিভার, নাড়িভুঁড়ির শক্তি পরীক্ষা করতেন। এমনকী রবারের হাতুড়ি দিয়ে হাঁটু, গোড়ালি পিটিয়ে রতনলাল রোগীর স্নায়ু-পেশি যাচাই করতেন।

বহু সময়ব্যাপী এই শারীরিক পরীক্ষা খুব খোলামেলাভাবেই করতেন রতনডাক্তার। এসব কারণে মহিলারা খুব অসুস্থ না হলে রতনলালের দ্বারা পরীক্ষিত হতে চাইতেন না।

সে যা হোক সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে রতনলাল রোগীকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'দুপুরে কী খান? রাতে কী খান?'

এই প্রশ্ন শুনে রোগীরা বুঝতে পারতেন, রোগীর খাদ্যাভ্যাস সব কিছু জেনে নিয়ে তারপরে তিনি ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেন।

ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। রতনলাল ডাক্তারের কম্পাউন্ডার ছিলেন আমার মাতুলালয়ের পাশের গ্রামের বংশীবাবু। বংশীবাবু আমার মামাকে বলেছিলেন, রতনডাক্তার রোগী কী খায় এটা জানতে চায় নিজ স্বার্থে।

মামা জানতে চেয়েছিলেন, সেটা কী রকম?

বংশীবাবু বলেছিলেন, সেটা ট্রেড সিক্রেট। এই কায়দা করে ডাক্তার রোগীর আর্থিক অবস্থা কেমন জেনে নেয়। যে লোকটা রাতে লুচি-মাংস, রাজভোগ খায়, দুপুরে খায় মাছ দু-তিন রকম, ডালনা তরকারি, চাটনি, দই-সন্দেশ—সে লোকটার টাকাপয়সা আছে। তার কাছ থেকে নানা ফিকিরে টাকা নেওয়া যাবে।

আবার যে দুপুরে খায় থোরছেঁচকি, ডাঁটাচচ্চড়ি, খেসারির ডাল, চারাপোনা, রাতে রুটি আর আলুর চচ্চড়ি, একটু গুড় তাকে অল্প ভিজিট নিয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তার কাছ থেকে খুব বেশি আশা করা ভুল হবে।

শাঁসালো রোগীর জন্যে সব ডাক্তারেরই নাকি এ রকম হিসেব থাকে।

এক অপারেশনের রোগীকে সার্জনসাহেব একবারে মোটা টাকা না দিতে বলে বলেছিলেন, 'এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিন। তারপর মাসে মাসে বারো হাজার টাকা করে দেবেন বছর দুয়েক।'

প্রস্তাব শুনে রোগী বললেন, 'এ যে একটা নতুন মডেলের মারুতি গাড়ির ইনস্টলমেন্টের মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

ডাক্তারবাবু ঢোঁক গিলে বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

রোগী প্রশ্ন করলেন, 'ঠিকটা কী?'

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, 'আসলে আমি ওই যে নতুন একটা মডেল বেরিয়েছে মারুতি গাড়ির, ওই একটা কিনব ভাবছি।'

অন্য এক ডাক্তারবাবু বাতব্যথায় জর্জরিত এক রোগীকে বলেছিলেন, 'চিন্তা করবেন না। আপনি ছয় মাসের মধ্যে রাস্তায় হাঁটবেন।'

ডাক্তারবাবুর কথা সত্য হয়েছে। চিকিৎসা করাতে গিয়ে রোগী সর্বস্বান্ত হয়েছেন। গাড়ি-বাড়ি বেচে দিয়েছেন, ছয় মাসের মধ্যে রাস্তায় হাঁটছেন।

পুনশ্চ:

ডাক্তারবাবুর চেম্বারে রোগী ও ডাক্তারবাবুর মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন—

ডাক্তারবাবু: আপনার পারিবারিক স্বাস্থ্যের ইতিহাসটা একটু জানা দরকার। আপনার বাবা-মা দুজনেই কি স্বাভাবিকভাবে মারা গিয়েছেন।

রোগী: ঠিক তা নয়। তাঁদের দুজনকেই মৃত্যুর আগে ডাক্তার দেখেছিল।

ভুল সঙ্কেত

একেক সময় একেকটা কথা খুব চালু হয়। যেমন আমাদের বাল্যকালে শুনেছিলাম, 'মার কৈলাস'।

সম্প্রতি একটা শব্দ, একটা যুগ্ম শব্দ, খুব চলছে 'ভুল সঙ্কেত'। কেউ কেউ ভুল আর সঙ্কেত আলাদা আলাদা করে দুটি শব্দ করছেন। কেউ কেউ একসঙ্গে ভুলসঙ্কেত লিখছেন, সমাসবদ্ধ পদ, ভুল যে সঙ্কেত।

আসলে বিলিতি সাংবাদিকদের মধ্যে নতুন একটা কথা চলছে, (wrong signal), যার শেষতম উদাহরণ, নেপালের নতুন রাজা সিংহাসনে বসে প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন।

এই হাসি বহুদিনের পরিচয় প্রসূত হতে পারে, সৌজন্যমূলক হতে পারে কিন্তু একটি জগজ্জয়ী সংবাদ সংস্থার মতে এই হাসি নাকি দূরদর্শনের মাধ্যমে নেপালি জনগণের কাছে রং সিগন্যাল (wrong signal) জানিয়েছে, বাংলায় যার মানে ভুল সঙ্কেত, নেপালি জনগণ এই চাপা হাসির মধ্যে একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছেন।

সাধারণ মানুষেরা কীসে যে কী বোঝে, তা বলা কঠিন।

এ বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী আছে। কাহিনীটি প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন।

কলকাতার মেট্রো রেলে কোনও কোনও ভূগর্ভ স্টেশনে সাধারণ সিঁড়ির পাশাপাশি এসকালেটর অর্থাৎ বৈদ্যুতিন চলমান সিঁড়ি আছে। কারও কারও কাছে চলমান সিঁড়ি ভীতির কারণ হলেও বহু লোকই কলকাতায় এসকালেটর ব্যবহার করে।

শতবর্ষ আগে লন্ডনের ভূগর্ভ-ট্রেনের স্টেশনে এসকালেটরের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেই প্রথম এসকালেটর মোটেই জনপ্রিয় হয়নি। যাত্রীসাধারণ সেই এসকালেটর এড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করত।

১৯১১ সালে চৌঠা অক্টোবর লন্ডনের ভূগর্ভ রেলের জাস্টিস ফোর্ট স্টেশনে এসকালেটর লাগানো হল। কিন্তু যাত্রীদের মনে এসকালেটর সম্পর্কে অহেতুক ভীতি, গভীর অবিশ্বাস। সবাই পুরনো সিঁড়ি দিয়ে নামাওঠা করে, আর দূর থেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চলমান সিঁড়ির দিকে তাকায়।

অনেক ভাবনাচিন্তা করে, যাত্রীদের সংশয় দূর করবার জন্যে রেল কর্তৃপক্ষ একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন। তাঁরা কাঠের পা-ওয়ালা এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন, যার একমাত্র কাজ হল সারাদিন ধরে ওই এসকালেটর চেপে একবার নেমে যাওয়া, পরেরবার উঠে আসা।

রেল কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন, এই 'পঙ্গুং লঙ্ঘয়তি এসকালেটরং' উদাহরণ দেখে যাত্রীরা সাহসী হবেন, তাঁরা চলমান সিঁড়ি ব্যবহার শুরু করবেন।

কিন্তু তা মোটেই হল না।

কিন্তু কেন?

ওই কাঠের পা-ওয়ালা খঞ্জ ব্যক্তি একটি ভুল সঙ্কেত রচনা করেছিল।

এসকালেটর কেমন জনপ্রিয় হয়েছে দেখতে একদিন রেলের বড়কর্তা এসেছেন। দেখলেন একটি বাচ্চা তার মায়ের কাছে আবদার করছে, এসকালেটর চড়বে বলে। বালকটি খঞ্জ লোকটিকে দেখিয়ে বলছে, 'ও খোঁড়া হয়ে যদি এসকালেটরে উঠতে পারে আমি পারব না কেন?'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর খোঁড়া হওয়ার কারণ জানো। ও খোঁড়া হয়েছে এই এসকালেটরে চড়ে।'

বলা বাহুল্য, এরপর খঞ্জ লোকটির চাকরি যায় এবং কালক্রমে একা একাই এসকালেটর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

রশিপুরম কে লক্ষ্মণের একটি কার্টুনে খুব চমৎকার একটি উদাহরণ আছে ভুল সঙ্কেতের।

মাস পয়লা। অফিসের পিওন কয়েক বাণ্ডিল টাকা নিয়ে এসেছেন বড়সাহেবের কাছে।

পিওনের কাছে টাকা দেখেই বড়সাহেব হাত বাড়িয়েছেন। সাধারণভাবে হাত বাড়ানো নয়, ডান হাত নয়, তিনি টেবিলের নীচ দিয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। পিওন বলছে, 'না, না, স্যার। এটা আপনার মাইনের টাকা।' অর্থাৎ এটা ঘুষের টাকা নয়, বাঁ হাতে লুকিয়ে নেবার কোনও প্রয়োজন নেই।

পিওনের হাতে নোটের বাণ্ডিল দেখলেই এমন ভুল সঙ্কেত পৌঁছে যায় অফিসারের কাছে যে তাঁর নিজের বেতনের টাকাও খেয়াল থাকে না, সেটাকেও ঘুষের টাকা মনে করেন।

যদ্দৃষ্টং

যদ্দৃষ্টং মানে যা দেখেছি। পুরো বাক্যটি হল, 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্।'

মানে হল, 'যা দেখেছি, তাই লিখেছি।'

যেমন লিখতেন কোম্পানির আমলের কলকাতায় বাঙালি কেরানিরা। ইংরেজি-না-জানা ওই বাবুরা ইংরেজিতে লেখা নথি থেকে নকল করতেন, ফলে নথির মধ্যে একটা মাছি মরে থাকলে সেটার পর্যন্ত হুবহু নকল পরের নথিতে ঢুকে যেত। সেই জন্যেই 'মাছিমারা কেরানি' কথাটা উদ্ভূত হয়।

'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্' আমার সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য। আমিও তো সারাজীবন ধরে এত যে লিখে গেলাম এর প্রায় সবই তো যা দেখেছি, যা পড়েছি সেই সব থেকে খুঁটে খুঁটে টুকে টুকে।

একটি ইস্কুলের ছেলের কথা মনে পড়ছে। তখন তার ইস্কুলে অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে, সেদিন তার বাংলা পরীক্ষা। চিরকাল যেমন হয়, যথারীতি বাংলা পরীক্ষায় গোরুর বিষয়ে রচনা এসেছে।

ছেলেটি, ধরা যাক তার নাম রাম, তার সিট জানলার পাশে। সে প্রথমেই গোরুর বিষয়ে রচনায় হাত দিয়েছে। খুব মন দিয়ে লিখছে, মাঝে মধ্যে মাথা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে, আবার মাথা গুঁজে লিখছে।

রামের ঠিক পিছনের বেঞ্চে সিট পড়েছে শ্যামের। সে আবার রামের চিরশত্রু।

সহসা পরীক্ষাকক্ষের নীরবতা বিদীর্ণ করে শ্যামের বীভৎস কণ্ঠ শোনা গেল, 'টুকছে, স্যার, রাম টুকছে।'

শিক্ষক মহোদয় যিনি পরীক্ষাকক্ষে গার্ড দিচ্ছিলেন, তিনি অকুস্থলে ছুটে এলেন। তিনি রামের খাতা উলটিয়ে দেখলেন, তার জামাপ্যান্টের পকেট তল্লাশি করলেন এবং শালীন-অশালীন আরও যা যা করা সম্ভব সবই করলেন, কিন্তু সন্দেহজনক কোনও কাগজ পেলেন না।

ইতিমধ্যে শ্যাম চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'স্যার ওখানে নয়, ওখানে নয়, বাইরে দেখুন।'

বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। শীতকালের প্যাঁচালো হাওয়া, বেশ ঠাণ্ডা। তারই মধ্যে স্যার বেরোলেন র‍্যাপার দিয়ে কান ঢেকে। তিনি ভেবেছিলেন, রাম বুঝি নকলের কাগজ জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সেখানে কিছুই নেই, একদম ফাঁকা। শুধু একটু দূরে একটা কাঁঠালগাছের নীচে একটা গোরু চোখ বুজে শীতে কুঁকড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্যার ফিরে এলেন। শ্যামকে ধমকাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই শ্যাম বলল, 'স্যার আপনি বুঝতে পেরেছেন তো?'

স্যার খেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী বুঝতে পেরেছি?'

শ্যাম বলল, 'গাছতলায় ওই যে গোরুটা। ওই গোরুটা দেখে টুকে টুকে রাম গোরুর

রচনা লিখছে।'

এ হল 'যা দেখেছি তাই লিখেছি' অর্থাৎ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতমের চূড়ান্ত উদাহরণ। ওর মধ্যে কোনও দোষ নেই। বড় লেখক, বড় শিল্পী সবাই এ কাজ করেন। জীবনের আনাচে-কানাচে যেখানে যেমন দেখতে পান, তাঁদের রচনা, ছবিতে কুশলী তুলি বা কলমের টানে ফুটিয়ে তোলেন, তার সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিলায়ে সানন্দে স্বীকার করেন, 'যা দেখেছি তুলনা তার নাই।'

সবাই অবশ্য নিজে দেখে লিখতে পারেন না। তাঁরা টুকে লেখেন। ওই যাঁরা দেখে লিখেছিলেন, তাঁদের লেখা দেখে টুকে লেখেন।

অন্নদাশঙ্কর একদা লিখেছিলেন,

শ্রীমান সমরেশ সেন,
পড়েছি যা লিখেছেন,
লিখেছেন যা পড়েছেন।'

কেউ কেউ বলেন, এখানে কবি সমর সেনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? কল্লোলের প্রধান লেখকেরা প্রায় সবাই, শিবরাম, মুজতবা এমনকী পরশুরাম পর্যন্ত এ গুণে গুণী।

কিন্তু কেউ আমার মতো নয়। আমিই সেই হতভাগ্য লেখক যে অন্য লেখকদের লেখাই শুধু নয় নিজের পুরনো লেখাও টোকে।

সম্পাদকেরা জানেন, পাঠকেরা বোঝেন—কিন্তু কেউ কিছু বলেন না, এই রক্ষা।

বয়েস বাড়ছে

আমাদের টাঙাইলের বাড়িতে অনেকরকম বই ছিল। পাঁচ পুরুষের ভিটেবাড়ি। উকিলের বাড়ি। প্রায় সবাই এম এ বি এল, বি এ বি এল। অধিকাংশই আইনের বই, এরই ফাঁকে ফাঁকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র-মিলটন এবং অনেকরকম আজব বই।

এসবের মধ্যে একটি বই ছিল কলম্বাসের জীবনী। পৃথিবীর যে কোনও ঘরকুনো লোকের মতোই কলম্বাস আমার চিরদিনের হিরো। সেই কলম্বাসের জীবনীকার ওয়াশিংটন আরভিং বলেছিলেন, 'যদি দেখেন লোকেরা আপনাকে বলছে খুব ইয়াং, খুব যুবক দেখাচ্ছে, বুঝে নেবেন বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।'

তারাপদ রায় নামে এক ব্যক্তিকে আমি জানি, সে লোকটা নিজের চোখের সামনে বুড়ো হয়ে গেল কিন্তু একবারও টের পায়নি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল গোলাকার থপথপে হয়ে গেছে, দাঁতের গোড়া সব নড়বড়ে হয়ে গেছে, পা ঢোলা, কোমরে বাত। হঠাৎ হঠাৎ হাঁফ ধরা, শেষরাতে শ্বাসকষ্ট।

প্রথম প্রথম বার্ধক্যের স্বাদ পাওয়ার পরে তারাপদ বয়েসের বিরুদ্ধে একটু লড়ার চেষ্টা করেছিল। একটু হাঁটাহাঁটি, একটু ডায়েটিং। কিন্তু কোনও সুবিধে হয়নি।

এই সময়ে একবার তারাপদ রায়ের বাঁ পা ফুলে গিয়েছিল, রীতিমতো ব্যথা। জুতো পায়ে দিতে, সামান্য হাঁটাহাঁটি করতে কষ্ট।

পুরনো ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে তিনি তারাপদকে বললেন, 'বয়েস বাড়ছে, বুড়ো হচ্ছেন, এখন এ রকম একটু-আধটু হবে। চিকিৎসা করে লাভ নেই, মানিয়ে নিতে হবে।'

তারাপদ ছাড়ার পাত্র নয়, সে জানে বুড়ো রোগী পেলে ডাক্তারেরা খুশি হয়, কারণ অসুখ বা ব্যারাম যাই হোক, ধরতে পারার দরকার নেই, বললেই হল, 'বুড়ো বয়েসে এ রকম হয়।'

কিন্তু তারাপদ সাধারণ বুড়ো নয়, সে ডাক্তারকে বলল, 'দেখুন বুড়ো হওয়ার জন্য যদি এই চরণশূল হয়ে থাকে তবে শুধু বাঁ পায়ে হল কেন, আমার বাঁ পা আর ডান পা দুটো তো সমান বয়েসি, ডান পা চরণশূল থেকে রেহাই পেল কী করে?'

ডাক্তারবাবু কী বলেছিলেন সে এই রম্যনিবন্ধের বিষয় হতে পারে না।

বরং বিষয়ান্তরে যাই। বয়েসের ব্যাপারটা অল্প একটু বুঝতে পেরেছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সেই কবে নবযৌবনে শক্তি লিখেছিলেন,

'বয়েস দাঁড়ায়ে থাকে
কোনও মাঠে স্কেলকাঠি হাতে,
মানুষ মাপিতে যায়,
মানুষী মাপিতে যায়,
বালকেরা হাসে।'

নিতান্ত কবিকল্পনা, কিন্তু কত স্বচ্ছ। একটু ভাবুন। উচ্চতা মাপার স্কেলকাঠির মতো বয়েসের স্কেলকাঠি। দিন যাচ্ছে, সময় যাচ্ছে—মাঠের মধ্যে সেই স্কেলকাঠি— মানুষ যাচ্ছে, মানুষী যাচ্ছে, বয়েস বাড়ছে সেটা ধরা পড়ছে স্কেলকাঠিতে, স্কেলকাঠি কিন্তু স্থির রয়েছে।

শক্তি হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেল। অথচ সেই সে আমাদের অনেককে বুড়ো বলে সম্বোধন করত, বলত, 'এই বুড়ো, আমি কিন্তু কোনওদিন বুড়ো হবো না। আমি অনেকদিন বাঁচবো।'

(শক্তির মৃত্যুদিন ছিল এই সপ্তাহে, তাই বোধহয় এসব কথা মনে পড়ছে। না হলে রম্যনিবন্ধে, সপ্তাহান্তে হালকা হাসির এই প্রতিবেদনে মৃত্যু আসে কী করে?)

মৃত্যু নয়, বয়েস বাড়ার কথা বলি। এ বিষয়ে জটিলতম এই কাহিনীটি অন্য প্রসঙ্গে আগে বলেছি, তবু বলি।

বছর বারো আগের কথা। তখন আমি নিকটবর্তী এক জেলা সদরে আমলা। মফস্বলে আমলাদের বিষয়-বহির্ভূত নানা কাজ করতে হয়, নানারকম তদারকি, সালিশি।

এক হাউসিং-এস্টেটের লোকেরা এসে অভিযোগ করল যে তাদের এস্টেটের যে দারোয়ান সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে। স্বামী-স্ত্রী দুইপক্ষই সমান, যেমন দেব তেমন দেবা। শেষরাত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কর্কশ চিৎকার, কুৎসিত গালিগালাজ—পাড়ায় কাক-চিল পর্যন্ত আসে না। প্রতিবেশীরা ঝালাপালা হয়ে গেছেন। আজ সেই বুড়ো-বুড়িকে সঙ্গে করে তারা এসেছেন এর প্রতিকার চাই।

বুড়ো-বুড়িকে দেখলাম। অনতিবৃদ্ধ অতি সাধারণ দম্পতি। বুড়োর সঙ্গে আলাদা করে কথা বললাম। মামুলি সরকারি প্রশ্ন, 'আপনার বয়েস?' উত্তর, 'ষাট'। 'আপনার স্ত্রীর বয়েস?' উত্তর, 'সত্তর'। একটু সন্দেহ হওয়ায় আমি জিজ্ঞেস করি, 'বিয়ের সময় আপনার বয়েস?' উত্তর, 'পঁচিশ!' 'তখন আপনার স্ত্রীর বয়েস?' উত্তর, 'কুড়ি'। আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম, 'তা হলে এখন আপনার স্ত্রীর বয়েস পঞ্চান্ন না হয়ে আপনার থেকে দশ বছর বেশি হল কী করে?'

আমার ঘরের দরজার বাইরে বেঞ্চির ওপরে বসে থাকা স্ত্রীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'মেয়েমানুষের যে কী বাড়, আপনাকে আর কী বলব হুজুর!'

সেই দাম্পত্যকলহের কী মীমাংসা হয়েছিল, সে গল্প পরে হবে।

ধানাই-পানাই

এই নিবন্ধের নামকরণে এ রকম একটি ব্রাত্য শব্দের ব্যবহারে কারও যদি আপত্তি থাকে, তিনি স্বচ্ছন্দে এর নামকরণ করতে পারেন 'শব্দরূপ'।

'ধানাই-পানাই'কে ব্রাত্য শব্দ বলাও হয়তো ঠিক হচ্ছে না। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল অভিধানে শব্দটির স্থান হয়নি। অবশ্য হাতের কাছে রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় শব্দটি রয়েছে, অর্থ দেয়া আছে, 'অসম্বদ্ধ বাগজাল বিস্তার'।

সপ্তাহন্তে কয়েক ইঞ্চি গদ্য রচনা করতে গিয়ে এমন অনেক শব্দের মুখোমুখি হই, পরিচিত প্রবাদবাক্যের মধ্যে এমন অন্যরকম আভাস পাই—যা আমাকে ভাবায়।

বলতে পারেন, লেখেন তো ওই হাবিজাবি গদ্য, কখনও কদাচিৎ অগভীর পদ্য, শব্দ নিয়ে আপনার এত ভাবনা কীসের।

সত্যি কথা স্বীকার করতে গেলে শব্দ নিয়ে, শব্দের ব্যবহার করা নিয়ে আমি যে খুব একটা বিচলিত তা নিশ্চয়ই নয় কিন্তু কখনও কখনও কোনও কোনও শব্দের অর্থ, ব্যবহার কিংবা উদ্ভব নিয়ে মনে প্রশ্ন যে জাগে না তা তো নয়। তত নির্বিকার নই।

যেমন এই ধানাই-পানাই শব্দটি।

শব্দটি কেমন গোলমেলে। প্রথম শুনলে মনে হবে অর্থহীন শব্দ। শব্দটি নিশ্চয়ই সংস্কৃতজ নয়, সংস্কৃত থেকে আসা শব্দগুলির, তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতদ্ভব সেগুলির ওপরে একটু ভাল করে চোখ বোলালেই তাদের সংস্কৃত চেহারা আন্দাজ করা যায়।

আবার আরবি-ফারসি-তুর্কি-মুসলমানি শব্দও নয়, সেগুলোর চেহারা আলাদা। এদিকে বিদেশি শব্দ, ইউরোপীয় ভাষা থেকে আগত ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ শব্দের মেজাজ অন্যতর।

অবশ্য হতে পারে বাংলা দেশি শব্দ, প্রাচীন অনার্য শব্দ। কিন্তু ধানাই-পানাই শুনলে খুব পুরনো শব্দ মনে হয় না। মনে হয় প্রায় আধুনিক, খুব কাছাকাছি সময়ের শব্দ এটা, যেমন তুলোধোনা, যেমন বাহিরফট্টাই।

এতদিনে হঠাৎ মনে হল ধানাই এবং পানাই এই দুটি আলাদা কথা একত্র হয়ে ধানাই-পানাই হয়েছে। ধানাই ও পানাই, ধানাই-পানাই দ্বন্দ্ব সমাস।

এর পরে কী করে মাথার মধ্যে খেলে গেল যে ওই ধানাই এবং পানাই আসলে হল ধা নাই এবং পা নাই। অর্থাৎ এমন ব্যাপার যার মধ্যে ধা এবং পা—এই দুটি নেই।

চকিতে মনে পড়ে গেল, 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি। ধা এবং পা বাদ দিয়ে যদি কেউ শুধুই সারেগামানি করে যায় সে হবে খুবই একঘেয়ে ও অসম্বদ্ধ সুর রচনা, হয়তো বা নিরর্থক।

ধানাই-পানাই ঠিক তাই। অনেকক্ষণ ধরে আমি যদি উলটোপালটা একই কথা ইনিয়ে

বিনিয়ে বলে যাই, আপনারা বলবেন, 'তুমি ধানাই-পানাই করছো।'

সুরসিক হিমানীশ গোস্বামীকে ফোন করেছিলাম ধানাই-পানাই নিয়ে আমার ব্যাখ্যা জানাতে। শ্রীযুক্ত গোস্বামী বাংলা শব্দের ব্যাপারে একজন বিশেষ ওয়াকিবহাল ব্যক্তি। তিনি বললেন, 'আপনার ধানাই-পানাইয়ের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। তবু শব্দটির অন্য কোনও উৎস আছে কি না সেটাই দেখতে হবে।'

এরপর হিমানীশ আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন যেটা তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব, "'দরদিয়া মরমিয়া" গানটি তো শুনেছেন। এর মানে কী বলতে পারেন?'

আমি 'জানি না' বলতে হিমানীশ বললেন, 'মোগলাই হোটেলে এক ব্যক্তি অনেক কিছু খেয়ে তারপর হেঁচকি তুলতে লাগলেন। তাঁর কাছে বেয়ারা বিল নিয়ে যেতে তিনি বললেন, "দেখছ, আমি মরতে বসেছি। এখন বিল নিয়ে এসেছ?" বেয়ারা এই কথা হোটেলের ম্যানেজারকে গিয়ে বলায় তিনি ছুটে এসে সেই খদ্দেরকে বললেন, "মর মিঞা দর দিয়া," অর্থাৎ, 'দাম দিয়ে মারা যাও।' এরপর ফোনের মধ্যেই গম্ভীর হয়ে হিমানীশ বললেন, 'গানের পংক্তিটি এর থেকেই এসেছে।' হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়। এবার একটা ভাল শব্দ নিয়ে বলি।

মা শব্দের মানে হল লক্ষ্মী। মা লক্ষ্মী কথাটি দ্বিত্ব দোষে দুষ্ট। মাধব হলেন লক্ষ্মীর স্বামী, বিষ্ণু। ধব শব্দটি দেখুন, এর থেকেই সধবা এবং বিধবা। লোকে যখন রসিকতা করে কোনও অবিবাহিতা মহিলাকে বলে অধবা, সেটাও খুব একটা ভুল নয়।

শিশু জিজ্ঞাসা

স্বার্থপর দৈত্যের সেই বিখ্যাত গল্পটি মনে আছে?

মনে না থাকার কথা নয়। স্কুলপাঠ্য বইতে এই গল্পটি প্রায় সবাই পড়েছেন।

স্বার্থপর দৈত্যের বাগান থেকে শিশুদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর সেই বাগানে ফুল আর ফোটে না, পত্রমঞ্জরী বিকশিত হয় না, কলকাকলি শোনা যায় না, প্রজাপতি আসে না।

আমাদের বাড়ির পাশে একটি ছোট পার্ক আছে, সরকারি ভাষায় যার নাম গ্রিন ভার্জ (Green Verge)। সেখানে বিকেল হতে না হতে শিশুদের হই-হুল্লোড়, হুটোপাটি শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু আজ কয়েকদিন হল দেখছি ছেলেমেয়েরা কেউ আর পার্কে আসছে না, খেলাধুলো, ছুটোছুটি নেই। শীত অপরাহ্নের ম্লান আলোয় ছোট মাঠটি নিস্তব্ধ, অবসন্ন পড়ে থাকে, ঠাণ্ডা বাতাসে শুকনো পাতা এলোমেলো উড়ে যায়।

মনে সন্দেহ হয়, কী জানি কী হল। কেউ কি কোনও 'প্রবেশ নিষেধ' নোটিশ জারি করে বাচ্চাদের পার্কে আসা আটকিয়ে দিয়েছে।

একটু খবর নিতেই অবশ্য প্রকৃত তথ্য জানা গেল। আমারই খেয়াল করা উচিত ছিল। সামনে বাৎসরিক পরীক্ষা এসে গেছে। ভারী ভারী বইখাতার বোঝার নীচে শিশুরা চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে পড়ে আছে। বাইরে বেরোনোর, পার্কে খেলাধূলো করার কোনও উপায় নেই।

আধুনিককালের শিশুশিক্ষায় পাঠ্যাপাঠ্য বইয়ের আধিক্য নিয়ে প্রবন্ধ লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। অন্তত এখানে নয়। আমার এই তরল নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল পাঠ্যের বাইরেও শিশুরা কত কী জানে বা জানতে চায়, সেটা জানানো।

একালের বাল্যজিজ্ঞাসার একটি নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

আমার, প্রতিবেশিনী এক অনতিবালিকা শিশুকালে, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত, আমার প্রতি গভীর আসক্তা ছিলেন।সম্প্রতি তিনি প্রায় কিশোরী বয়েসে পৌঁছে আমাকে এখন মোটামুটি এড়িয়ে চলেন। শুধু কখনও কদাচিৎ আসেন আমার বুদ্ধির পরীক্ষা করতে।

চিরকালই যেমন ছিল স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানারকম বুদ্ধির প্রশ্ন ঘোরাফেরা করে। তার মধ্য থেকে দুয়েকটি প্রশ্ন তিনি আমার জন্যে বাছাই করে নিয়ে আসেন।

আজ শনিবার তাঁর স্কুল ছুটি, তিনি আমাদের বাসায় এসে আমার ইজিচেয়ারের হাতলে বসলেন, (আগে কণ্ঠলগ্না হতেন, এখন একটু দূরত্ব রক্ষা করেন।) তারপর বললেন, 'দাদামশায়, আজ তোমার বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করতে হবে।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই। তুমি সঙ্গে দৌড়বে তো?'

তিনি বললেন, 'দাদামশায় হেঁয়ালি ছাড়ো। আমার তাড়া আছে। তোমাকে প্রশ্নটা

দুজনার আগের পক্ষের দুই ছেলের মধ্যে বেশ সদ্ভাব, মোটামুটি বন্ধুত্বই রয়েছে। এখন তাদের দুজনারই বয়েস প্রায় আট বছর।

কিছুদিন হল একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে। বড় দুই ভাই ছোট ভাইকে দুচোখে দেখতে পারে না। সুযোগ পেলেই, কারণ অকারণে তাকে পেটায়। মনীষাদেবী কোনও ভাবে ছোট ছেলেকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

কিন্তু একদিন মারাত্মক অবস্থা দাঁড়াল। বড় দুই ভাই ছোট ভাইকে এক সঙ্গে পেটানো শুরু করল। মনীষাদেবী তাদের বিরত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। অবশেষে তিনি ছুটে মনীশবাবুকে গিয়ে বললেন, 'ওগো, একবার বারান্দায় যাও। তোমার ছেলে আর আমার ছেলে আমাদের ছেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে বসেছে।'

এ রকম গল্প এর পরে আর টানা উচিত নয়। বরং একেবারে উলটো দিকের অন্য একটা গল্প বলি।

এখন তো পরীক্ষার মরসুম চলছে। আমার যেমন স্বভাব, জনে-জনে জিজ্ঞাসা করি, 'কী পরীক্ষা ছিল? কেমন পরীক্ষা দিলে?'

পাড়ার ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে আমার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে এদিক ওদিক ঘুরে আমাদের বাড়ির পথ এড়িয়ে যায়।

সেদিন একটিকে ধরে ফেললাম, এর ডাক নাম ভোম্বল। ভোম্বল পরীক্ষা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরছে, আমি তাকে ডাকতে সে দাঁড়িয়ে গেল। ভোম্বল ছেলেটি অন্যদের তুলনায় একটু বেশি নরম।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ কী পরীক্ষা ছিল?'

ভোম্বল বলল, 'অঙ্ক।'

আমি বললাম, 'কটা অঙ্ক ভুল হয়েছে?'

ভোম্বল বলল, 'একটা অঙ্ক ভুল করেছি।'

শুনে খুশি হয়ে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কতগুলো অঙ্ক দিয়েছিল প্রশ্নপত্রে?'

পকেট থেকে প্রশ্নপত্র বার করে সেটা বেশ ভাল করে, উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখে নিয়ে সে বলল, 'সবসুদ্ধ দশটা অঙ্ক কষতে দিয়েছিল।'

আমি বললাম, 'তা হলে তুমি এবার অঙ্কে নব্বুই পেয়ে যাবে।'

ভোম্বল বলল, 'না। তা পাবো না।'

আমি বললাম, 'দশটার মধ্যে যদি একটা অঙ্ক ভুল হয়, তা হলে নব্বুই পাবে না কেন?'

অম্লানবদনে ভোম্বল বলল, 'বাকি নয়টা তো আমি চেষ্টাও করিনি।'

দৃষ্টিবিভ্রম

প্রভাত দেবসরকারকে মনে আছে? প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় পঞ্চাশের দশকে যাটের দশকে তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার কখনও আলাপ-পরিচয় হয়নি। তাঁর বহু গল্প বিখ্যাত সাপ্তাহিক-মাসিক কাগজে, দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় ম্যাগাজিনে বা শারদ সংখ্যায়, মনে হয়, এই যেন সেদিনও পড়েছি।

কিন্তু সেদিনের কথা নয়, আমি যে গল্পটার কথা বলতে যাচ্ছি সে গল্পটা প্রকাশিত হয়েছিল একটি দৈনিক পত্রিকায় রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায়, অন্তত বিশ-পঁচিশ বছর আগে।

প্রভাত দেবসরকারের কোনও গল্পসংগ্রহ বাজারে আছে কি না জানি না। আমার নিজের কাছেও নেই। ফলে প্রভাতবাবুর যে গল্পটি এই দৃষ্টিবিভ্রমের প্রথম উদাহরণ হিসেবে টানছি, তার সবটা বলতে পারছি না।

একটু আবছায়াভাবে স্মরণ করছি।

কথা আছে না, রজ্জুকে সর্পভ্রম করা। কথাটার সরাসরি মানে হল দড়িকে সাপ ভাবা। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। আর যেখানে সাপের ভয় সেখানেই লোকে ভুলভাল সাপ দেখে। এক টুকরো দড়ি পড়ে আছে উঠোনের এক কোণে, ঘর বা বারান্দা থেকে সেটা দেখেই মনে হয় সাপ বুঝি।

কিন্তু সবসময় দড়িকেই সাপ ভেবে ভুল হয় তা নয় কখনও কখনও সাপকেও দড়ি মনে হতে পারে।

প্রভাত দেবসরকারের গল্পের বিষয়বস্তু ছিল এটাই। যতদূর মনে পড়েছে, গল্পটা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের। একটা নতুন জায়গায় প্রতিদিন সান্ধ্যভ্রমণে তাঁর সঙ্গী হন আরেকজন ভদ্রলোক। ফাঁকা রাস্তায় অচেনা সঙ্গীটির সঙ্গে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির অনেকরকম আলোচনা হত। সব আলোচনাই ঘুরে ফিরে পরলোক, ভূত, প্রেত এইসব বিষয়ে এসে শেষ হয়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কখনওই টের পেতেন না এই অচেনা ভদ্রলোকটি কোথা থেকে আসেন আর ঠিক কখন ভদ্রলোক চলে যান। চলতে চলতে এক সময়ে হঠাৎ দেখেন ভদ্রলোক পাশে নেই। এই ভদ্রলোকটিই একদিন ওই প্রৌঢ়কে বলেছিলেন, 'বুঝলেন সবসময় রজ্জুকে সর্পভ্রম হয় তেমন কিছু নয়, অনেক সময় সর্পকেও রজ্জুভ্রম হয়।'

বলাবাহুল্য এই ভ্রমণসঙ্গী অচেনা ভদ্রলোকটি একটি সর্প যাঁকে রজ্জু বলে, ভূতকে মানুষ বলে ভ্রমণ হয়েছিল। এরই নাম দৃষ্টিবিভ্রম।

দৃষ্টিবিভ্রমের, একটা সমস্যা হল, আমি হয়তো একটা জিনিস ঠিক দেখতে পাচ্ছি, অপরে পাবে কি না সে নিয়ে সন্দেহ।

পরীক্ষার খাতায় রচনা লিখতে গিয়ে জনৈক পরীক্ষার্থী প্রথম 'স্বাধীনতা দিবসের' ওপরে রচনা লেখার চেষ্টা করে কিন্তু পাতা দেড়েক লেখার পর সে বুঝতে পারে যে কিছু

হচ্ছে না, তখন সে মত বদলায়, অলটারনেটিভ ছিল 'গুজরাটের ভূমিকম্প'। সে ভাবে এটা লেখাই ভাল হবে। এবং এই ভেবে সে আবার রচনাটি কেটে দিয়ে নতুন রচনায় হাত দেয়।

ইতিমধ্যে পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা পড়ে গেছে। পরের রচনাটি মাত্র আট দশ লাইন লেখা হয়েছে। উত্তেজনাবশত পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় রচনাটিও কেটে দিল। তারপর প্রথম রচনাটির কাটা চিহ্নগুলি রবার দিয়ে ঘষে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা ভাল হল না।

দুটো রচনাই কাটা, এই অবস্থায় ছাত্রটি প্রথম রচনার পাশে লিখল, 'এ কাটা কাটা নয়', 'This cut is no cut' এবং দ্বিতীয় রচনার পাশে লিখল 'এ কাটা কাটা', 'This cut is cut' তারপর লিখল দয়া করে প্রথম রচনায় নম্বর দেবেন। জানি না এর পরেও পরীক্ষকের দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল কিনা?

পুনশ্চ, দৃষ্টিবিভ্রমের চূড়ান্ত কাহিনী:

হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ, দাঁত ভাঙা, চোখ ফোলা, চোর কাঠগড়ায়। সাক্ষীর বাক্সে এক দশাসই মহিলা।

বিচারক সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সাহস তো কম নয়। এইরকম দুর্দান্ত চোরকে এমন পেটালেন।'

সাক্ষীর কাঠগড়ায় মহিলা বললেন, 'হুজুর ও যে চোর আমি বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছি আমার হাজব্যান্ড বুঝি। আমার হাজব্যান্ডও মাতাল হয়ে ওইভাবে অনেক রাতে পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকে। সবদিন সুযোগ পাই না, ওইদিন পিটিয়ে দিয়েছি। এখন দেখছি ও আমার হাজব্যান্ড নয়।'

আমপাতা জোড়া-জোড়া

'আমপাতা জোড়া-জোড়া,
মারব চাবুক ছুটবে ঘোড়া...'

এ ছড়ার দিন বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার দিন আর নেই। হয়তো গ্রামগঞ্জের দিকে গেলে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা যাবে নিঃসঙ্গ কোনও অশ্বারোহীকে, ঘোড়ার খুরের ধুলো উড়িয়ে যাচ্ছেন। দু-একটা আদ্যিকালের এক্কা কিংবা টমটম গাড়িও হয়তো চোখে পড়বে চিরকালের ভাঙা রাস্তায় সওয়ার নিয়ে চলেছে। চোখে পড়বে দু-একটা মালবাহী ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়িও।

নগর ও শহরাঞ্চলে এখন ঘোড়া দেখতে গেলে রেসের মাঠে কিংবা সার্কাসের তাঁবুতে যেতে হবে। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গোটা তিনেক প্রাগৈতিহাসিক ফিটন গাড়িও কয়েকবছর আগে পর্যন্ত দেখা যেত, এখনও আছে কি না বলতে পারি না।

অথচ এই তো সেদিন, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে, দেশ থেকে যেদিন কলকাতায় এলাম, শেয়ালদা স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েই কলকাতার বাসায় গিয়েছি।

আমাদের বাল্যকালে রূপকথার গল্পে পড়েছি, রাজপুরীতে হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। সেসব রাজপুরী আমরা স্বচক্ষে দেখিনি তবে ঘোড়াশালে ঘোড়া ব্যাপারটা বুঝতাম। হাতিশালে হাতি আমার বাল্য বয়েসেরও আগের ব্যাপার, হয়তো আমার শিশু প্রপিতামহই তাঁর কালে ব্যাপারটা বুঝতেন।

তবে, ঘোড়া তখনও ছিল। আমাদের মফস্বলে উকিলবাড়িতে মক্কেলরা অনেকেই আসত ঘোড়ায় চড়ে। চোখের সামনে ধীরে ধীরে দেখেছি অশ্বারোহীর সংখ্যা কমছে, সাইকেলারোহীর সংখ্যা বাড়ছে। সাইকেল বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত সব ঘোড়াকেই আউট করে দিল। শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র ঘোড়া সেটি ছিল গয়েশ পালের।

গয়েশ পাল ছিলেন একজন তস্কর প্রধান। এমনিতে তাঁর হাটে সোনারুপোর দোকান ছিল। সেই দোকানে বসেই তিনি স্থানীয় গৃহস্থের ধন-দৌলতের তাৎক্ষণিক আঁচ করলেন। যথাসময়ে যথাস্থানে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করে অন্তরালে থেকে তস্করবৃত্তি পালন করতেন। বলা বাহুল্য, কাজটি বিপজ্জনক ছিল। মাঝে মধ্যেই তাঁকে পুলিশ ধরত। তাঁকেও উকিল-আদালত করতে হত।

গয়েশবাবুকেই দেখেছি শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় করে যাতায়াত করতে। তিনি খুব সকাল সকাল আমাদের বাড়িতে এসে ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম খুলে একটা লম্বা দড়ি দিয়ে কাছারিঘরের পাশে একটা সুপারি গাছের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বাঁধতেন। পরে সন্ধ্যাবেলা কাছারির কাজ শেষ হলে আমাদের বাসায় ফিরে ঘোড়ায় উঠে গ্রামে ফিরে যেতেন। অন্তর্বর্তী আট-দশ ঘণ্টা ঘোড়াটি থাকত আমার আর দাদার হেফাজতে। চাবুক হাতে

আমরা তার সওয়ারি হওয়ার চেষ্টা করতাম। ঘোড়াটিকে আমরা নিশ্চয়ই খুবই নির্যাতন করতাম। কারণ একবার সেই ঘোড়া আমার ঘাড়ে কামড়ে দিয়েছিল। এখনও ঘোড়ার দাঁতের চৌকো চিহ্ন আমার ঘাড়ে স্পষ্ট দেখা যায়।

ঘোড়ার ঘটনা এতকাল পরে মনে পড়ল খবরের কাগজে একটা সংবাদ দেখে। মাননীয়া মানেকা গান্ধীর উদ্যোগে পশুক্লেশ নিবারণী বিধি সমূহে এখন থেকে একটা নতুন মাত্রা যোগ হতে যাচ্ছে। এখন থেকে ঘোড়াকে আর চাবুক মারা যাবে না। চাবুকের বদলে হালকা ধরনের কোনও কিছু প্রয়োগ করতে হবে।

খবরটি পাঠ করে গঙ্গারাম একটি বাঁকা কথা বলল, 'এরপর হয়তো সরকারি নির্দেশ থাকবে যে গোরু দোয়া যাবে না।'

গঙ্গারামকে তেমন পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'ঘোড়ার গল্পে গোরু কেন?'

গঙ্গারাম বলল, 'আপনি বুঝি গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্পটা পড়েননি?'

আমি বললাম, 'কোন গল্পটা?'

গঙ্গারাম বলল, 'পুরনো গল্প। এক গৃহস্থ তীর্থে গিয়েছেন। যাওয়ার সময় তাঁর গোরু রেখে গেছেন প্রতিবেশীর কাছে। ফিরে এসে গোরু ফেরত চাইতে তিনি বললেন, 'খুবই দুঃখের কথা, তোমার গোরু হঠাৎ মরে গেছে।' এ কথা কেউ বিশ্বাস করে? তখন সেই প্রতিবেশী ওই গৃহস্থকে গো-ভাগাড়ে নিয়ে একটি কঙ্কাল দেখালেন। কিন্তু দেখা গেল সেটি ঘোড়ার কঙ্কাল। গৃহস্থ প্রতিবেশীকে সেকথা বলতে প্রতিবেশী বললেন, 'কী আর বলব দাদা, তোমার গোরু ওই ঘোড়ারোগেই মারা গেছে।'

এ গল্পের মানে কী ধরতে পারলাম না। তবে গঙ্গারাম তো এই রকম গল্পই বলে।

বইমেলা ও পাগল

যেকোনও রকম মেলা বা বাজারেই পাগল দেখা যায়। অনেক বাজারেরই নিজস্ব পাগল থাকে, এক বা একাধিক। মেলা সাধারণত বছরে একবার, একই জায়গায় হয়। মেলার কদাচিৎ স্থান পরিবর্তন হয় এবং বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেই মেলা হয়।

পাগলেরা ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা সচেতন না হয়েও টের পেয়ে যান কোথায়, কখন, কোন মেলা। তাঁরা অবশ্যই হাজিরা দেন।

বইমেলা এর ব্যতিক্রম নয়। প্রতি বছর বইমেলায় অর্থাৎ কলিকাতা পুস্তক মেলায় নির্দিষ্ট একাধিক পাগলকে দেখা যায়। বছরের পর বছর তাঁরা আসেন এবং নীরবে অথবা সরবে তাঁদের ভূমিকা পালন করেন। তবে অনেক সময় একই জায়গায় একাধিক পাগলের আবির্ভাব হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া তৈরি হয়। জনসাধারণের পক্ষে সেটা খুব নিরাপদ নয়।

অনেকদিন আগের কথা। তা প্রায় চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবরা রেলস্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দূরে শিক্ষকতা জীবিকার সূত্রে কচুয়ার মোড় নামে এক জায়গার খুব কাছে থাকতাম। কচুয়া হল অশোকনগর এবং কল্যাণগড় এই দুটি বর্ধিষ্ণু উদ্বাস্তু উপনগরী। এখন তো সব মিলে পূর্ণনগরী হয়ে গেছে।

সে যা হোক, এই কচুয়া মোড় থেকে অশোকনগর এবং কল্যাণগড় এই দুই নগরই অনেকটা দূরে ছিল। হাবরা বাজার তো আরও দূরে। স্থানীয় অধিবাসীরা ঠিক করলেন, এই মোড়ে আমাদের নিজেদের একটা বাজার চাই। বাজার বসাতে গেলে অনেকরকম বিধিনিষেধ, আইন মেনে চলতে হয়। তখনকার উদ্বাস্তুমণ্ডলীর মেজাজ তা ছিল না। ঢোল শহরৎ করে, মাইকের চোঙায় ঘোষণা করে বাজার শুরু হল। অল্প অল্প করে দোকানপাট, কেনাকাটা আরম্ভ হল।

বাজারের সামনে আমাদের ক্লাব। আমার তখন বাইশ বছর বয়স, সবাই আমাকে তুমি বলেন। সেই ক্লাবঘরে আমরা সন্ধেবেলা বসি। সেখানে স্থানীয় নেতা নরেন দত্তমশায় এসে আমাকে বললেন, 'তারাপদ বাজার তো বসিয়েছ, কিন্তু পাগল ছাড়া কি বাজার জমে?' আমি তাঁর প্রশ্ন ভাল করে বুঝতে না পারায়, তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'বাজারহাটে দু-একটা পাগল লাগে। তা না হলে বাজার জমে না। কিন্তু মারকুটে পাগল হলে বিপদ আছে।'

পাগলের সমস্যা অচিরেই সমাধান হয়। কাছাকাছির মধ্যে কল্যাণগড় বাজারে দুজন ছিল, তারা পরস্পর দারুণ ঝগড়া, মারামারি করত। তাদেরই একজনকে (বোধহয় ভোলা পাগলা নাম ছিল) ভুলিয়েভালিয়ে কচুয়া বাজারে নিয়ে আসা হল। ইতিমধ্যে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে কচুয়া বাজারে নতুন এক পাগল এসে জুটেছেন। দুদিনের মধ্যে দুই পাগলে খুনোখুনি, হুটোপাটি, মারামারি। অবশেষে এক সন্ধ্যায় ক্লাবঘরে নতুন

পাগলকে নরেনবাবু বললেন, 'দাদা, আমাদের নতুন বাজার ছোট বাজার, দুজন পাগলের জায়গা হবে না। আপনি অন্য কোথাও চেষ্টা করুন।' তিনি কী বুঝলেন কে জানে, কিন্তু পরদিন থেকে তাঁকে আর দেখতে পেলাম না।

না, এবারের বইমেলায় পাগলের ঘাটতি ছিল না। প্রধান প্রবেশপথের দুপাশে দুজন ছিলেন। দুজনের মধ্যে কোনও যোগসাজশ ছিল কি না জানি না, কিন্তু দুজনে দশদিন ধরে প্রায় একই প্রশ্ন বিড়বিড় করে জিজ্ঞাসা করেছেন নিকটতম দর্শককে। বাঁদিকের জন জানতে চেয়েছেন, 'এত বই কে পড়বে?' ডানদিকের জনের জিজ্ঞাসা, 'এত বই কে কিনবে?' সদুত্তর না পেয়ে হতাশ হয়ে তাঁরা দুজনেই বেপাত্তা হয়েছেন।

তবে বেপাত্তা হননি সেই স্থূলকায়, প্রৌঢ় ভদ্রলোক। যিনি প্রথমদিন থেকে জনে জনে জিজ্ঞাসা করে গেছেন, 'স্যার, এবারের মেলাতেও কি 'পিপীলিকাদের যৌনজীবন' বইটি বেরোয়নি?'

অন্য এক ব্যক্তি নীরব কর্মী। তাকে দেখলে, পাগল বলে কার সাধ্য। অক্লান্তভাবে সেই প্রথমদিন থেকে স্টলের সংখ্যা গুনে যাচ্ছেন। ডানদিক থেকে বাঁদিকে গুনলে যা হচ্ছে উলটোদিকে সংখ্যা বিশ-পঁচিশটি কমে যাচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান নেই। তবে বইমেলায় একা একা কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন এমন কাউকে দেখে পাগল সন্দেহ শুরু করার আগে যাচাই করে নিন তাঁর কানে সেল-ফোন রয়েছে কি না?

পুনশ্চ:

কসবার শ্রী প্রবীণ পাঠক দজ্জাল বউয়ের অত্যাচারে বইমেলাতেই প্রতিদিন সন্ধ্যা কাটিয়ে রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরেন। এই গতকাল বইমেলার দশম দিনে বাড়ি ফিরে দেখেন বউ পালিয়েছে। কাছেই একটি উন্মাদ-আশ্রম, সেখানে গিয়ে প্রবীণবাবু খোঁজ করলেন, 'আপনাদের এখান থেকে কোনও পাগল পালিয়েছে?' তারা অবাক, 'না পালায়নি। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?'

প্রবীণ পাঠক বললেন, 'কোনও পাগল ছাড়া আমার বউকে নিয়ে কেউ পালাবে না।'

বড়লোক

না।

যতদূর মনে পড়ছে কোনওদিন বড়লোক নিয়ে আমি কিছু লিখিনি।

বড়লোক মানে বড় মাপের মানুষ নয়, টাকাওয়ালা লোক—এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখার অধিকার আমার নেই। আমি কোনও কালে বড়লোক নই, ছিলাম না, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

কাছাকাছি লোকের মধ্যে গঙ্গারাম, তার আর্থিক অবস্থাও আমার চেয়ে বোধহয় ভাল নয়, মাঝে মধ্যে আমি তার কাছ থেকে বিশ-পঁচিশ টাকা ধার করি, আবার সে কখনও আমার কাছে কিছু টাকা চায়, সব সময়ে যে দিতে পারি তা নয়।

'অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ' বলে সংস্কৃতে একটা কথা আছে না, আমার তো চিরকালই 'দিন-আনি, দিন-খাই' অবস্থা, কয়েক বছর আগে এই নামে একটা কবিতার বই পর্যন্ত লিখে ফেলেছিলাম, যে বইয়ের প্রথম কবিতার প্রথম পঙক্তি ছিল,

'আমরা যারা দিন আনি, দিন খাই।'

গঙ্গারাম আর আমার কথা বলে লাভ নেই, মনে রাখতে হবে এ রচনার নাম 'বড়লোক'। একটু বলা যাক, বড়লোকদের কথা।

বিখ্যাত ধনকুবের মহেশ পোদ্দার তাঁর ব্যস্ত কর্মসূচি থেকে বহুকষ্টে দুদিন ছুটি নিয়েছেন তাঁর বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে। স্ত্রী মালতীকে নিয়ে বিশাখাপত্তনমে একটি দামি হোটেলে এসে উঠেছেন।

কিন্তু প্রথম রাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে পাশাপাশি শায়িতা মালতীর শরীরে হাত দিয়ে মহেশ দেখেন, একেবারে হিমশীতল, নিথর, নিস্পন্দ।

স্থিরবুদ্ধি পোদ্দার মশায় তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামলেন। ঘরের এক প্রান্তে টেলিফোন রয়েছে, সেই টেলিফোনে হোটেলের রুম-সার্ভিস ধরলেন, 'হ্যালো, রুম সার্ভিস, আমি মিঃ পোদ্দার, তিনতলায় তিনশো এগারো নম্বর ঘর থেকে বলছি। গতকাল সন্ধ্যায় আমার ঘর থেকে দুটো ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়েছিলাম, একটা অর্ডার ক্যানসেল করে দিন, দুটো নয় একটা ব্রেকফাস্ট লাগবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ। একজন নেই, সেইজন্য তার ব্রেকফাস্ট অর্ডারটা ক্যানসেল করতে হচ্ছে। সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স।'

এই রকম মর্মান্তিক গল্প বলে খুব খারাপ লাগছে। এবার একটা বড়লোক ঘেঁষা সাদামাটা গল্প বলি।

গল্পটা আমার পাঠকদের চেনা, কিন্তু গত বৎসর ঢাকা গিয়ে দেখলাম এক তরুণ কবি ছড়ার আকারে গল্পটি লিখেছেন।

গল্পটি সংক্ষিপ্ত করে বলি,

শামিম নামে এক যুবক শামিমা নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়েছেন। শামিম

খুবই চেষ্টা করছেন শামিমার স্বামী হওয়ার।

এর জন্যে যত রকম তোষামোদ সম্ভব, যত রকম টুকটাক উপহার দেওয়া সম্ভব শামিমাকে শামিম তা যথাসম্ভব জুগিয়ে যান। চকোলেট, চুইংগাম থেকে প্রসাধনী, পারফিউম, বই, ক্যাসেট সব কিছু। সেই সঙ্গে অপরিমিত স্তাবকতা।

শামিমা কিন্তু টলেন না। এমনকি টলটলায়মান পর্যন্ত মনে হয় না তাঁকে।

অবশেষে মোক্ষম অস্ত্র হানলেন শামিম। বললেন, 'বেঙ্গল ইন্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানির আবু বকর সাহেবের নাম জানো? অত বড়লোক দেশে নেই, ওই আবু সাহেব আমার সাক্ষাৎ মামা।'

এবার শামিমা তৎপর হল। তারপর? ছড়াটির শেষ সোয়া এক লাইনে শামিমের জবানবন্দি,

'... শামিমা,
এখন আমার মামিমা।'

পুনশ্চ:

বড়লোকদের প্রতি নিবেদন:

গরিব হওয়ার একটা সুবিধের কথা আপনাদের বলি। আপনারা বোধহয় জানেন না, গরিব থাকার জন্যে খুব একটা টাকাপয়সা খরচ করতে হয় না। অল্প ব্যয় করেই গরিব থাকা চলে।

আবার বড়লোক

আমার মতো হতদরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে 'বড়লোক' নিয়ে লেখায় হাত দেওয়া সঠিক কাজ হয়নি। বড়লোকেরা অবশ্য এসব তুচ্ছ আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু আমার সমগোত্রীয় গরিবেরা আমাকে খোঁচাচ্ছেন। বড়লোকদের বিষয়ে আমি আর কী জানি, বলার মতো কী সব কেচ্ছা আছে—সবই নাকি বলতে হবে।

তা হলে সব চেয়ে পরিষ্কার গল্পটা আগে বলি।

সুন্দরী, সুশ্রী, চটকদার মেয়ে অনামিকা। তার সঙ্গে গভীর প্রণয়, গলায় গলায় প্রেম বনেদি বড়লোক নীলোৎপলের।

অনামিকাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়, তদপুরি শ্রীমতী অনামিকার সাজপোশাক, প্রসাধনী-সুগন্ধি, বিউটি পারলার ইত্যাদির পয়সা জোগাতে অনামিকার বাবা জনার্দনবাবু একেবারে জেরবার।

এদিকে অনামিকার সঙ্গে নীলোৎপলের বিয়ে প্রায় ঠিক হওয়ার মুখে। এই সুসংবাদ অনামিকার মা সরলাদেবী জনার্দনবাবুকে শোনালেন। জনার্দনবাবু শুনে খুশিই হলেন, কিন্তু একটা দ্বিধা আছে তাঁর মনে। তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'কিন্তু আমাদের এ রকম সাধারণ অবস্থা আর ওই নীলোৎপল, ওদের তো লাখ লাখ টাকা, ওর এত বড়লোক।'

একথা শুনে সরলাদেবী হেসে ফেললেন, তারপর স্বামীকে বললেন, 'তুমিও যেমন! অনামিকার সঙ্গে বিয়ের পর নীলোৎপলরা আর কতদিন বড়লোক থাকতে পারবে? অনামিকা সব উড়িয়ে দেবে। ওদের অবস্থাও আমাদের মতো হয়ে যাবে।'

এই অনামিকাকেই নীলোৎপল কিন্তু প্রশ্ন করেছিল, 'আজ আমরা কোটি টাকার মালিক। কিন্তু কাল যদি ভাগ্য বিমুখ হয়, আমাদের অবস্থা যদি পড়ে যায়, তুমি আমাকে কি তখনও ভালবাসবে? এইরকম ভালবাসবে তুমি?'

অনামিকা বলেছিল, 'তুমি কি ভাবো, তোমার দাম এক কোটি বলে আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার টাকা যদি কমে যায়, সত্তর লাখ, ষাট লাখ এমনকী পঞ্চাশ লাখ হয়ে যায়, তা হলেও আমি তোমাকে ভালবাসব।'

শুধু শোনা কথা নয়, গঙ্গারামের ব্যাপারটাও বলি। বড়লোকদের বিষয়ে গঙ্গারামের একাধিক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

গঙ্গারাম প্রথম যৌবনে এক ধনীতনয়ার প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু সে প্রেম থাকেনি।

প্রণয় পরিপক্ক হওয়ার পর্যায়ে যখন এসেছে সেই সময় একদিন প্রেমিকার পিতৃদেব গঙ্গারামকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি একটা কথা বলো দেখি, যদি কালকেই শোনো যে আমরা হঠাৎ খুব গরিব হয়ে গেছি, তা হলেও কি তুমি আমাকে মেয়েকে এইরকমই ভালবাসবে?'

গঙ্গারাম বলেছিল, 'অবশ্যই।'

এই কথা শোনার পর গঙ্গারামের সেই হলেও হতে পারতেন শ্বশুরমশায় গঙ্গারামকে ঘাড়ে ধরে তার বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বললেন, 'ইডিয়ট, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও! তোমার মতো গাধা আমার মেয়ের সঙ্গে আর মেলামেশা করুক এটা আমি চাই না। তুমি এবার বিদায় হও।'

আপনিও বড়লোক হতে চান?

না। কে বনবে ক্রোড়পতি, কিংবা এরপরও দশ ক্রোড়পতি, সেরকম কোনও দূরদর্শন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বলছি না।

বরং এই মুহূর্তে একটি টাকা জমান।

কাল এর দ্বিগুণ, পরশুদিন তার দ্বিগুণ। এইভাবে জমাতে জমাতে একমাস বাদে কত টাকা হবে বলুন তো?

বিশ্বাস করুন কিংবা না করুন, হিসেবটা করে দেখুন আপনার সঞ্চয় হবে পঞ্চাশ কোটি এবং সেদিনই আপনি প্রকৃত বড়লোক হবেন।

ভ্রমণকাহিনী

'ডোডো-তাতাই' কাহিনীমালায় এক জায়গায় আছে, ডোডোবাবু (নাকি তাতাইবাবু) একবার দূরপাল্লার ট্রেনে কোনও দূরদেশ থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন। রেলগাড়ির ওই কামরাতেই ডোডোবাবুর সহযাত্রী ছিলেন এক সর্দারজি।

আসানসোল স্টেশন চলে যাবার পরই সর্দারজি চঞ্চল হয়ে উঠলেন, হাওড়া কতদূর, হাওড়া পৌঁছোতে আর কতক্ষণ লাগবে, মুহুর্মুহু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ভদ্রলোক ডোডোবাবুসহ অন্যান্য যাত্রীদের অস্থির করে তুললেন।

স্বভাবোচিত ঠাণ্ডা মাথায় ডোডোবাবু প্রথমদিকে সর্দারজিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, হাওড়া এখনও দূরে আছে, হাওড়া স্টেশনে আমিও নামব। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

ইতিমধ্যে সর্দারজি তাঁর হাতব্যাগ খুলে গুরুমুখী ভাষায় ছাপা একটি রেলওয়ে টাইমটেবিল বার করে ফেলেছেন। দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের জানলা দিয়ে ক্রম অপসৃয়মান ছোট স্টেশনগুলির নাম তিনি পাঠ করার চেষ্টা করছেন, পাঠ করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর টাইমটেবিলে মিলিয়ে নিচ্ছেন, হাওড়া আর কতদূর?

অবশেষে যথানিয়মে ট্রেন বর্ধমান, ব্যান্ডেল পেরোল। উদ্বিগ্ন সর্দারজি তাঁর বিশাল ট্রাঙ্ক, বিপুল বিছানা গাড়ির দরজার কাছে নিয়ে রেখে এসে ফাঁসির আসামির মতো থমথমে মুখে নিজের সিটে এসে বসলেন। শেষ পর্যন্ত উত্তরপাড়া, বালি স্টেশনও পার হয়ে গেল, ঝড়ের বেগে এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটছে, কোথাও দাঁড়াচ্ছে না, সর্দারজি আশঙ্কান্বিত হয়ে ডোডোবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই ট্রেনটা হাওড়ায় দাঁড়াবে তো?'

কামরাসুদ্ধ যাত্রী এই সরল প্রশ্ন শুনে থমকিয়ে গেল। শুধু ডোডোবাবু প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা সর্দারজি হাওড়ায় ট্রেনটা না দাঁড়ালে কী হবে?'

উত্তেজিত সর্দারজি বললেন, 'তা হলে আমার সর্বনাশ হবে।'

ডোডোবাবু বললেন, 'সর্বনাশ আমাদের সকলেরই হবে। হাওড়ায় ট্রেন না দাঁড়ালে আমরা সবাই মারা পড়ব, ট্রেন স্টেশনের দেয়াল ভেঙে গঙ্গায় গিয়ে পড়বে।'

ভ্রমণকাহিনী পর্বে সর্দারজি বিষয়ক আর একটি নিষ্কলুষ কাহিনী আছে।

দুই সর্দারজি এক নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একদিন দুপুরে প্রচুর খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সন্ধ্যায় যখন ঘুম ভাঙল তখন দিগন্তে চাঁদ উঠেছে। সেদিন আবার পূর্ণিমা, বিরাট ঝলমলে চাঁদ। জ্যোৎস্নায় চারদিক ফুটফুট করছে।

গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রথম সর্দারজি ভাবছিলেন, 'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, কে জানে। এখন তো মনে হচ্ছে সকাল হয়েছে। সারারাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম নাকি?'

দ্বিতীয় সর্দারজিরও ওই একই চিন্তা। কিন্তু তিনি চুপ করে না থেকে রাস্তায় গিয়ে এক তৃতীয় সর্দারজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই ওই যে আকাশে গোল থালামতো জিনিসটা

উঠেছে, যে জিনিসটা এত আলো দিচ্ছে, ওটা চাঁদ না সূর্য?'

প্রশ্ন শুনে তৃতীয় সর্দারজি বহুক্ষণ ধরে পূর্ণিমা চাঁদটি নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বেশ কয়েকবার ঘাড়ে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'ভাই আমি এখানে মাত্র এক বছর হল এসেছি। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার ভাল বুঝি না। ওটা চাঁদ কি সূর্য সেটা বলতে পারব না।'

পুনশ্চ:

একবার দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে বাড়ির কাছেই পাশাপাশি দুটো মুদির দোকান। একটি সাবেকি, পুরনো আমলের দোকান। পাশেরটি নতুন হয়েছে।

যেদিন প্রথম সেই পুরনো দোকানে মালপত্র কিনতে গেলাম, প্রবীণ দোকানি বললেন, 'সাবধান! পাশের ওই নতুন মুদিখানা থেকে কোনও জিনিস কিনতে যাবেন না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

মুদি ভদ্রলোক গলা নামিয়ে প্রায় ষড়যন্ত্রী কণ্ঠে বললেন, 'ওদের তো দাঁড়িপাল্লা ছিল না। আমাদের পুরনো দাঁড়িপাল্লা কিনে নিয়ে গেছে।'

জল

কয়েক বছর আগে বইমেলায় আমার যে কয়টি বই বেরিয়েছিল তার মধ্যে একাধিক বইয়ের নাম ছিল জল দিয়ে, যেমন জলভাত (মিত্র ও ঘোষ), জলের মত কবিতা (আনন্দ) ইত্যাদি। কেউ কেউ পরিহাসছলে জিজ্ঞাসা করেছিল,'এত জল কেন?'

কথায় বলে জলের মতো সোজা। কোনও কোনও অঙ্কের মাস্টারমশায় ছেলেদের জটিল অঙ্ক বুঝিয়ে দেন জলের মতো করে।

জল সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?

এটুকু জানি যে জলই জীবন। একদা আমরা অহঙ্কার করেছি যে আমাদের দেশ সুজলা, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন...'সুজলাং সুফলাং মাতরম।'

কিন্তু এখন আমরা জেনে গেছি আমাদের জল সুজল নয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে বহু স্থলের জল পানের যোগ্য নয়, পান করলে শরীরে বিষক্রিয়া হয়, ত্বক পচে যায়, গায়ে দগদগে ঘা বেরোয়।

এ ছাড়াও জল সহজেই নানাভাবে দূষিত হয়। দূষিত জল পানে আন্ত্রিক, আমাশয়, জন্ডিস অনেক রকম বিপজ্জনক পেটের রোগ হতে পারে।

ফলে সাম্প্রতিককালে জল সম্পর্কে মানুষের মনে, ন্যায্য কারণেই, নানারকম ভীতির সঞ্চার হয়েছে। এবং এরই সুযোগে পানীয় জল বাজারে পণ্যে পরিণত হয়েছে, সিল করা প্লাস্টিকের বোতলে জল বিক্রি হচ্ছে রীতিমতো চড়া দামে। এই জল কতটা বিশুদ্ধ, কোথায়, কীভাবে বোতলস্থ হয়েছে সে বিষয়েও অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ আছে।

বোতলের জল যে কোনও শহরে প্রথম চালু হয় টুরিস্ট পাড়ায়। তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলিতে বেড়াতে এসে সাহেবদের দেশের লোকেরা খোলা জল খেতে ভয় পায়। তাদের জন্যেই প্রথম এই জলের প্রচলন। এর পরে সভাসমিতিতে, বিশেষত সরকারি অনুষ্ঠানে, বাণিজ্যসভায় বোতলের জল চালু হয়, অবশেষে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে।

আমি প্রথম বোতলের জল খাই বছর দশেক আগে ব্যাঙ্কক শহরে টুরিস্ট এলাকায়। একেক বোতল জলের দাম পাঁচ থাই ভাট, প্রায় পাঁচ টাকা। আমি নিজে খুব একটা জল কিনে খাইনি। কারণ আমি দেখেছি পথের ধারের ছোট খাবার দোকানে বা চায়ের রেস্তোরাঁয় সাধারণ কলের জলই গেলাসে করে দিচ্ছে। আমিও তাই খেতাম।

পৃথিবীর অন্তত দুটো প্রধান শহরে আমি বিজ্ঞপ্তি দেখেছি, পৌরসভার বিজ্ঞাপন, 'আমাদের শহরের পানীয় জল দূষণ মুক্ত, নির্ভয়ে পান করুন।' এ রকম দাবি করার সাহস কম কথা নয়, কিন্তু সিঙ্গাপুর এবং সানফ্রানসিসকো পৌরসভার প্রশংসা করতেই হয়।

জল সম্পর্কে হঠাৎ এই যে এত কথা বলছি তার একটা সাম্প্রতিক কারণ আছে।

আমার এক বন্ধু বড় মাপের দুগ্ধ ব্যবসায়ী। তাঁর দুধের ডেয়ারি আছে, কলকাতার উপকণ্ঠে। তিনি পলিপ্যাকে করে আধ লিটার দুধের ব্যাগ শহরে-বাজারে বিক্রি করেন। প্রতি প্যাক সাড়ে পাঁচ টাকা।

বেশ রমরমা ব্যবসা চলছে। এরই মধ্যে তিনি আমাকে তাঁর নতুন কারখানার উদ্বোধন উৎসবে নিমন্ত্রণ করলেন। গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তা নয়, এবার দুধের ডেয়ারি নয়, দুধের ডেয়ারির পাশেই জলের কারখানা। দুধ পলিপ্যাকে বিক্রি হয়, আর জল বিক্রি হবে প্ল্যাস্টিকের বোতলে।

সভার শেষে আমার সুরসিক বন্ধু আমাকে আলাদা করে বললেন, 'এখন থেকে আর বলতে পারবে না যে আমি দুধে জল মেশাই।'

আমি বললাম, 'কেন?'

তিনি বললেন 'পোষাবে না। দুধ বেচছি এগারো টাকা লিটার আর জলের এক লিটারের বোতল হল বারো টাকা। দুধে জল মেশালে প্রতি লিটারে এক টাকা ক্ষতি হবে।'

জলের রচনায় একটি পুরনো গল্পে ফিরে যাই।

আমার এক তরুণ কবিবন্ধু বিখ্যাত সুরসাধক অর্থাৎ মদ্যপ। নির্জলা মদ্যপানে তার গভীর আসক্তি। পান করার সময়ে তার সামনে যদি আমি থাকি সে খুব পছন্দ করে না কারণ আমি তার গেলাসে জল মিশিয়ে নেওয়ার জন্য জোর করি, চাপ সৃষ্টি করি। পানীয়কে একটু বেশি জলীয় করে দিই।

হঠাৎ খবর পেলাম কবি নার্সিংহোমে, তার নাকি নিমুনিয়া, বুকে জল জমেছে। আমি তাকে দেখতে যেতে সে আমার ওপরে রাগারাগি করতে লাগল, 'দাদা আপনার জন্যে আমার এই অবস্থা।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'মানে?' সে বলল, 'আপনি খালি মদের মধ্যে জল মিশিয়ে দেন। মদটা বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে, আপনার জলটা বুকের মধ্যে আটকিয়ে আছে।'

হাস্যকবি সম্মেলন

সুকুমার রায় লিখেছেন না, 'লাল গানে নীল সুর হাসি-হাসি গন্ধ', বারবার সেই লাল গান, নীল সুরের কথা ভাবছিলাম।

ব্যাপারটা খুলেই বলি।

'হাস্যকবি সম্মেলন' মানে হাসির কবিতার লেখকদের সম্মেলন। দিল্লি, মুম্বই, পটনায় খুবই চালু অনুষ্ঠান এটা। জনপ্রিয় বটে।

আমাদের কবি সম্মেলনের মতো নীরস নয়।

বাংলা ভাষায় লঘু মেজাজের সঙ্গে গভীর অনুভূতির হালকা হাসির কবিতা লিখে গেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায়। আমাদের কালে অজিতকৃষ্ণ বসু কিংবা আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ফেলনা নন। কিন্তু এঁরা কেউ কি কখনও ভাবতে পেরেছেন হাসির কবিতার সঙ্গে খোল, ঢোল, মৃদঙ্গ, করতাল। এমনকী এস্রাজ, বেহালা।

ডি এল রায়ের গানের সঙ্গে বাজনা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু হাস্যকবি সম্মেলন তো গান নয় পুরোই কবিতা। হিন্দি বলয়ের সংস্কৃতি জগতের অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।

একজন কবিতা পড়ছেন। সঙ্গে দু-একজন তাল দিচ্ছেন। আবার তিনি একই কবিতায় ফিরছেন প্রতি অনুচ্ছেদ অন্তর। এবার তিনি গান গেয়ে একই দুপংক্তি নিবেদন করছেন, সঙ্গে হরেক রকম দিশি-বিদিশি বাদ্যযন্ত্র। আমি এসেছিলাম একটা আমন্ত্রণ পেয়ে। কিন্তু অনুষ্ঠানটি ঠিক হজম করতে পারিনি। এইসব পদ্য-গীতের ফাঁকে ফাঁকে ছিল টুকরো টুকরো হাসির গল্প। তার কিছু কিছু উপভোগ করেছি।

দিল্লিওয়ালা এক কবি, বোধহয় তাঁর নাম ভগবতীপ্রসাদ একটা মজার গল্প বললেন। তিনি কোনও কাজে এক ডাকঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁকে একটি পোস্টকার্ড দিয়ে বললেন, 'আমার হাতে বাতব্যথা, আপনি যদি আমার চিঠিটা লিখে দেন।'

ভগবতীবাবু কী আর করবেন, তিনি ঠিকানাসমেত চিঠিটা লিখে দিলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক পোস্টকার্ডটা হাতে নিয়ে বেশ একটু উলটেপালটে দেখলেন, তারপর পোস্টকার্ডটি ভগবতীপ্রসাদের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নীচের দিকে একটু জায়গা আছে। যদি আরেকটা লাইন লিখে দেন।'

বাধ্য হয়ে ভগবতীবাবু বললেন, 'কী লিখতে হবে বলুন।' বৃদ্ধ বললেন, 'লিখুন, খারাপ হাতের লেখার জন্যে দুঃখিত।'

সত্যিই চমৎকার গল্প। আরও দুয়েকটি রীতিমতো ভাল গল্প শুনেছিলাম। আর একটি বলছি।

ঝাঁঝা থেকে এসেছেন এক কাব্যরত্ন। শ্রীযুক্ত মুরারি ঝা। অতিরিক্ত সুরসিক ব্যক্তি।

মুরারিবাবু বললেন যে তিনি ঠিক ঝাঁঝার লোক নন। তবে তাঁর পদবি ঝা হওয়ায়

তিনি ঝাঁঝাকেই তাঁর বাসস্থান বলে বেছে নিয়েছেন। এটা বলার সময় ভদ্রলোকের মুখচোখের ভাব দেখে মনে হল, কথাটা বোধহয় সত্যি নয়।

স্বাস্থ্যবান, কৃষ্ণকায়, গাট্টাগোট্টা ভদ্রলোককে কেউ ঘাঁটাল না।

এরপর মুরারিবাবু বললেন যে তাঁর নামের অর্থ হল কালো মানুষদের শত্রু। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, মুরারি = মুর + অরি, স্বরসন্ধি, আর মুর মানে হল কৃষ্ণাঙ্গ বা কালো মানুষ, যেমন শেক্সপিয়ার সাহেবের 'ওথেলো দ্য মুর'।

অভিধানে অবশ্য 'মুর' শব্দের মানে একটু অন্যরকম বলছে, সে যা হোক মুরারিবাবু শ্রোতাদের আশ্বস্ত করে বললেন, 'আমি কালোদের শত্রু নই, আমি নিজেই কালো।'

মুরারিবাবু কাব্যরত্ন হলেও কাব্যচর্চা করলেন না। তিনি গুটিকয় মজার গল্প করলেন। দু-একটি বেশ ভাল, তারই একটি মনে পড়ছে।

মুরারিবাবু রেলগাড়িতে কোথাও যাচ্ছিলেন, তাঁর পাশের সিটে বসেছিলেন সর্দারজি। সহসা মুরারিবাবু লক্ষ করলেন যে সহযাত্রী সর্দারজির একপায়ে লাল মোজা, অন্য পায়ে সাদা মোজা।

এ রকম মজার/মোজার ব্যাপার দেখে মুরারিবাবু কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল এটা হয়তো নতুন কোনও স্টাইল।

শেষ পর্যন্ত মুরারিবাবু সর্দারজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিংজি, আপনার দুপায়ে দুরকম মোজা। আগে কখনও এ রকম কোথাও দেখিনি।' সর্দারজি নাকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার আরও এক জোড়া মোজা আছে, কিন্তু দেখলাম সেটারও এক পাটি লাল আর অন্যটা সাদা।'

মুরারিবাবুর প্রকাশভঙ্গি চমৎকার। সেদিন খুব হেসেছিলাম। কিন্তু আজ লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে ঠিক এই রকম একটা গল্প আগেও শুনেছি।

বিবাহমঙ্গল

সরস্বতী পুজোর সময় ফোটার কথা কিন্তু দেরি করে এই ফাল্গুনে অবশেষে পলাশ ফুটল। আমার দোতলার জানলার সামনে একটি নবীন পলাশ গাছ, লালে লাল হয়ে গেছে। দূরে কোথাও সানাই বাজছে।

লাল অক্ষরে ছাপা, সিঁদুর-হলুদের ফোঁটা দেওয়া চিঠিতে ভরে গেছে ডাকবাক্স। এর মধ্যে একটি চিঠি রয়েছে একদা অকালপক্ক এক বালিকার, যে এখন ব্রীড়াবনতা তরুণী। তারই শুভবিবাহ।

এই বালিকার কথা অনেকদিন আগে একবার লিখেছিলাম। পাঠক-পাঠিকারা হয়তো সে কাহিনী মনে রাখেননি।

মেয়েটি ছিল আমাদের প্রতিবেশীর কন্যা। তখন তার চার-পাঁচ বছর বয়স, কিংবা একটু বেশিও হতে পারে।

সেই সময়ে পাড়ার মধ্যে চাঞ্চল্যকর একটি বিয়ে নিয়ে তাদের বাড়িতে আমাদের রবিবারের আড্ডা সরগরম। ঠিক মনে পড়ছে না, খুব সম্ভব প্রায় নিকট সম্পর্কীয় দুই যুবক-যুবতী লুকিয়ে কালীঘাট গিয়ে বিয়ে করে এসেছিল।

বেশ মুখরোচক গল্পই চলছিল চা এবং তেল-মুড়ির সঙ্গে। নানারকম উদাহরণ, অনেক রসালো বর্ণনা।

একটু দূরে মোড়ায় বসে বালিকাটি সব শুনছিল। বলা উচিত, গল্পগুলি গিলছিল। হঠাৎ সবাইকে থামিয়ে দিয়ে সে তার মাতৃদেবীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, তোমার কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল?'

তার মা বললেন, 'কেন, তোর বাবার সঙ্গে।'

এই কথা শুনে সেই অকালপক্ক বালিকা চোখ গোলগোল করে, গালে হাত দিয়ে অবাক গলায় বলল, 'সে কী এত জানাজানির মধ্যে।'

গল্পটি লিখলাম বটে। কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছে এই ভেবে যে এই গল্প পড়লে সেই মেয়েটি এখন লজ্জায় পড়বে। কিন্তু বাঁচোয়া এই যে অন্যেরা কেউ কিছু বুঝতে পারবে না, হয়তো তারও কিছুই মনে নেই।

সে যাক, বিয়ের বিষয়ে গল্পের কোনও অন্ত নেই। এক কিস্তিতে সব গল্প হবে না। আমি বরং আপাতত বিবাহজনিত দুটো গোলমেলে গল্পের কথা বলি।

দুটো গল্পই আর্থিক সঙ্কোচনের।

বিয়ে খুবই খরচের ব্যাপার। আগে দশ-বিশ টাকায় বিয়ের সম্পূর্ণ কার্ড ছাপা হয়ে যেত। এখন নানারকম, নানা দামের রকমারি কার্ড। একেকটা কার্ডের দামই কোনও কোনও ক্ষেত্রে দশ-বিশ টাকার বেশি।

সব কিছুতেই খরচ বেড়ে গেছে। বাড়ি ভাড়া, ডেকরেটর, আলোকসজ্জা, গয়নাগাটি,

উপঢৌকন, পানাহার সবই শুধু খরচ, খরচের পর খরচ।

এইরকম ভয়াবহ খরচের পরে এক ব্যক্তি ঘোষণা করেছিল যে সে কর্পদকশূন্য। আর একটি টাকাও খরচের জন্যে তার কাছে নেই।

সবাই তখন বলল, সে কী এত হইচই করে বিয়েটা সারলে আর তারপরে একটা জুতসই হনিমুন হবে না।

সে প্রথমে বলল, অসম্ভব। তারপরে সকলের পীড়াপীড়িতে সে নিমরাজি হল। সুটকেস গুছিয়ে হনিমুনের জন্যে রওনা হল, একাই। সবাই বলল, সে কী একা একা হনিমুন হয় নাকি। সুটকেস হাতে ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে সে বলল, কোনও উপায় নেই। আমার কাছে দুজনার হনিমুনের পয়সা নেই, আমাকে একাই যেতে হচ্ছে। আপনাদের বউমাকে, এ কয়দিন একটু দেখবেন।

দ্বিতীয় গল্পটা অবশ্য এত ভয়ানক নয়। এক্ষেত্রে পাত্র তারিখ বেছে বেছে লিপইয়ারে ঊনত্রিশে ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেছিল।

খুব সহজ কারণ, বিবাহবার্ষিকীতে একটা খরচ হয়। বছর বছর পৌনঃপুনিক ব্যয়। এই ব্যয়টা সাশ্রয় হবে লিপইয়ারে বিয়ে করায়। যদি চল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবন হয় তবে চল্লিশবার বিবাহবার্ষিকী না করে দশবার করলেই হবে। আর আজকাল যেমন হয়েছে সুবর্ণজয়ন্তী, হীরকজয়ন্তী এসব উদযাপন করার কোনও প্রশ্নই আসে না।

বাজেট ও গঙ্গারাম

সারা সপ্তাহ সময় পাইনি। রাজ্য সরকারের বাজেটের পরের দিনের খবরের কাগজটা আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম। শনিবার সকালে চা খাওয়া হয়ে গেলে সেই কাগজটা টেবিলের ওপরে ছড়িয়ে বাজেটটা ভাল করে দেখছিলাম। নতুন কী কর বসল, পুরনো কী কর কমল বা বাড়ল। কোন খাতে সরকারি খরচ কেমন কমানো হয়েছে সেটা খুঁটিয়ে দেখলে সরকারের অভিপ্রায় স্পষ্ট বোঝা যায়।

বাজেট সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা আছে। রাজ্য সরকারের মহাকরণে দীর্ঘকাল চাকরি করেছি। বাজেটের একটা ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ অংশের বাৎসরিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সরবরাহ করার দায়িত্ব ছিল আমার। পুজো সংখ্যার লেখার মতোই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অবশ্য-অবশ্য দিতে হবে। ছোটখাটো ভুলচুক অনেক সময়েই হত, তবে বৃহত্তর আঙ্গিকে তাতে মূল বাজেটের খুব হেরফের হত না।

আজকাল তো বছরে দুবার বাজেট প্রায় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পয়লা এপ্রিল নতুন আর্থিক বছর আরম্ভ হওয়ার আগে প্রথম চারমাসের জন্য ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট বাজেট পাস করিয়ে নেয়া, তারপর জুন-জুলাইয়ের বাকি আট মাসের বাজেট।

মনে আছে, প্রথম যখন চার মাসের জন্য ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট হল আমরা ভেবেছিলাম এ কী গোঁজামিল ব্যাপার রে বাবা! এখন তো এটা একটা নিয়মিত বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাজেটটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম, এই জঙ্গলের অনেক অলিগলিই আমার চেনা। হঠাৎ মূর্তিমান হিসাবভঙ্গ, গঙ্গারাম এসে হাজির।

আমি পেন্সিল হাতে মনোযোগ দিয়ে বাজেট দেখছি লক্ষ করেও গঙ্গারাম কিন্তু অদমিত।

সে আমার পর্যবেক্ষণে বাধা দিয়ে বলল, 'দাদা, বিয়ে করার খুব সুবিধে হয়ে গেল।'

আমি থামালাম, গঙ্গারাম বলল সধবা রমণীর আলতা-সিঁদুরের কথা, এই বাজেটের ফলে যার দাম কমে যাচ্ছে। আমি তার মুখের দিকে তাকাতে সে বলল, 'আলতা, শাঁখা-সিঁদুর সব কিছুর দাম কমে গেল, সধবা থাকার কোনও খরচাই লাগছে না।'

'শাঁখার ব্যাপারটা ভুল বললে', আমি বললাম, 'এ বাজেট শাঁখার কথা কিছু বলেনি।'

গঙ্গারাম বলল, 'তো শাঁখা বাদ থাক। আলতা-সিঁদুরের দাম কমাই যথেষ্ট। আর আজকাল তো মহিলারা শাঁখা পরেন না। গড়িয়াহাট মোড়ে, বড়বাজারে বিশাল বিশাল সাইনবোর্ড দেখবেন, আমাদের কোনও শাঁখা নেই।'

আমি হেসে তাকে বললাম, 'মূর্খ, ও শাখায় চন্দ্রবিন্দু নেই। এ শাখা হল ব্রাঞ্চ, মানে দোকান জানাচ্ছে যে তাদের কোনও শাখা নেই।'

গঙ্গারাম বলল, 'ঠিক আছে শাঁখা-সিঁদুরের কথা থাক। কিন্তু এই বাজেটে আবার একটা অন্যায় হয়েছে?

কী অন্যায়, জানতেই হল।

গঙ্গারাম বলল, 'আবার দিশি-বিলিতি মদের দাম বাড়িয়েছে।'

আমি বললাম, 'দিশি-বিলিতি ব্যাপারটা কী? ব্যাসবাক্য কী? দিশি ও বিলিতি, দিশি অথচ বিলিতি, নাকি দিশির মতো বিলিতি, অথবা যাহা দিশি তাহাই...'

গঙ্গারাম আমার হেঁয়ালি থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না, দাদা ইয়ার্কি নয়। দিশি হুইসকির এক-একটা বোতলের দাম আট-দশ টাকা বেড়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তাতে তোমার কী? আর আমার কী?' প্রশ্নটা করে গঙ্গারামের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন সন্দেহ হল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি মদ ধরেছ নাকি?'

গঙ্গারাম মুখ কাঁচুমাচু করে কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'তা সরকার আর্থিক দায়ে পড়ে দু-দশ টাকা দাম বাড়ায় উপায় নেই বলে। কিন্তু মদের দামের কোনও মা-বাবা নেই। ধর্মতলা, চৌরঙ্গিতে অনেক দোকান, কিছুটা ন্যায্য দাম। শহরতলিতে, মফস্বলে একেবারে গলাকাটা ব্যাপার। আপনার এই সল্টলেকে একটাই দোকান, সে দোকানে প্রত্যেক বোতলের দাম ধর্মতলার থেকে অন্তত বিশ-পঁচিশ টাকা বেশি। এ টাকা তো সরকারের ঘরে যাচ্ছে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। এ অভিযোগে আমি কী বলব। আমাকে চুপ দেখে গঙ্গারাম বলল, 'তা হলে একটা গল্প বলি। সল্টলেকের ওই মদের দোকানে একদিন একটা গোরু এক বোতল মদ কিনল। দাম দিয়ে, মদ নিয়ে গোরুটা চলে যাচ্ছে তখন দোকানের কর্মচারী বলল, 'এতকাল এই দোকানে আছি, কোনও দিন আপনার মতো কোনও গোরুকে মদ কিনতে দেখিনি।' গোরুটি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আর কখনওই দেখবেন না। আপনাদের দোকানে মদের যা দাম।'

গঙ্গারামকে বললাম, 'এ তো আমারই পুরনো গল্প।' সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

কাব্যগ্রন্থ

কবে যেন, কোন এক জন্মে আমি কবি ছিলাম। সাহিত্য সরোবরের তীরে ঘুরে ঘুরে কাব্যসরস্বতীর অমল ধবল রাজহংসের দু-একটি শ্বেতশুভ্র পালক আমি কুড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম।

সেই জের টেনে এখনও কবি সম্মেলনে যেতে হয়। সুদূর গ্রামগঞ্জ থেকে ছোট পত্রিকার সম্পাদক 'কবি তারাপদ রায়' সম্বোধন করে নতুন কবিতার জন্যে আকুতি জানান।

সে এক অন্য ভুবন। 'কি খবর'-এর পাঠক-পাঠিকারা অধিকাংশই তার খবর রাখেন না। আমিও কি আর তেমন করে রাখি?

আমার হাবিজাবি নাকি হিজিবিজি তরল-অতরল গদ্যের জঙ্গলে সেই সরোবর আড়ালে পড়ে গেছে। তবু এখনও কবিতা লিখি, লিখতে হয়। বৎসরান্তে নাগরিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় বা শারদীয়া সঙ্কলনে কিংবা নিকটদূর মফস্বলের ছোটখাটো পত্রিকায়, যার প্রচার দু-চারশোর বেশি নয়।

এইভাবে তিন-চার বছরে একটি কাব্যগ্রন্থের পরিমাণ মুদ্রিত কবিতা আমার জমে যায়।

বাংলা কাব্যগ্রন্থের স্ট্যান্ডার্ড আয়তন হল চার ফর্মা বা চৌষট্টি পৃষ্ঠা। তার মধ্যে আটপাতা টাইটেল। বাকি পৃষ্ঠাগুলির জন্য ছোট-বড় মিলিয়ে পঞ্চাশটি কবিতা হলেই মোটামুটি হয়ে যায়।

এইভাবে গত চল্লিশ বছর ধরে আমার বারো-চোদ্দটি কবিতার বই বেরিয়েছে। কবিতার বইয়ের বিক্রি কখনও তেমন ভাল নয়, অন্তত আমার রম্যরচনা বা গল্পের বইগুলির তুলনায়; তবু প্রকাশকেরা দয়া করে সেগুলো ছেপেছেন। অবশ্য প্রথম দুটি বই নিজেই পয়সা দিয়ে ছাপিয়ে ছিলাম।

মনে আছে, সম্প্রতি পরলোকগত তখন নিতান্ত শিশু, আমার ছোট ভাই বাচ্চু আমার প্রথম কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি কী করে যেন খেলতে খেলতে বারান্দার ওপাশে রান্নাঘরে গিয়ে উনুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। আমার এই অভিযোগ শুনে আমার মা হেসে বলেছিলেন, 'সে কী? বাচ্চু পড়তে শিখেছে নাকি।'

একটা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। নানা জায়গায়, নানারকমভাবে ছাপা ছোট-বড়, খারাপ-ভাল সব কবিতা সেগুলো কাট-ছাঁট করে, সাজিয়ে গুছিয়ে অর্থাৎ যথাসম্ভব পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে তারপরে বইয়ে দিতে হয়। বলতে গেলে কবিতা সংশোধন করার ওই শেষ সুযোগ। আর কত কী যে সংশোধন করতে হয়। মফস্বলের পুরনো এক পত্রিকায় আমার নাম ছাপা হয়েছিল তাড়াপদ, অন্য এক লিটল ম্যাগাজিনে দেখেছি তাঁরাপদ। যাঁরা কবির নাম বানানেই এমন করেন, তাঁরা

কবিতার মধ্যে কী করেন, কী করতে পারেন কল্পনাও করা যায় না। কী করে যে ঝকঝকে বকবকে হয়ে যায় এবং একেক সময় মনে হয় ভালই হয়েছে ঝকঝকে আকাশ অপেক্ষা বকবকে আকাশ অনেক বেশি কথা বলে।

এবারের পাণ্ডুলিপি সাজাতে সাজাতে মনে পড়ল কয়েক মাস আগে একটি পাঁচমিশেলি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত আমার একটি প্রিয় কবিতার কথা, তার কাটিং খুঁজে পেলাম না। তখনই একটা বুদ্ধি এল মাথায়। পাড়ার সেলুনে দাড়ি কামাতে গেলাম। সেখানে গাদা গাদা পুরনো পত্রপত্রিকা অপেক্ষমানদের মনোরঞ্জনের জন্যে। একটু খুঁজে পেয়ে গেলাম আমার সেই কবিতাটি। দাড়ি কামাতে আট টাকা খরচ হল বটে কিন্তু এটা না পেলে পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ হত না।

কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি সবে সিজিল মিছিল করে রেখেছি, গঙ্গারাম এসে হাজির। ভাগ্যিস আগে আসেনি, তা হলে অনেক টানা-হেঁচড়া হত।

তা আজ দেখা গেল সে কবিতার ব্যাপার নয় বৃহত্তর বিষয়ে বিচলিত।

গঙ্গারাম ঘরে ঢুকেই কোনও ভূমিকা না করে গজরাতে লাগল, 'কিচ্ছু হচ্ছে না। কিচ্ছু হচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'কী হচ্ছে না?'

গঙ্গারাম বলল, 'আপনাদের লেখাটেখা এমনকী টিভি সিরিয়াল সব বোর হয়ে গেছে, একঘেয়ে হয়ে গেছে। কেউ দেখছে না।'

আমি বললাম, 'প্রমাণ কিছু আছে?'

গঙ্গারাম বলল, 'বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীরা পর্যন্ত কি খবর না পড়ে, টিভি সিরিয়াল না দেখে এখন মাথা গুঁজে ইস্কুলের হোমওয়ার্ক করছে।'

বলা বাহুল্য, এই দুঃসংবাদে আমি মোটেই বিচলিত নই, আমার কবিতা বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী কখনও পড়েনি। পড়বেও না।

মুড়ি-মিছরি

আগে একটা কথা ছিল 'মুড়ি-মিছরির এক দর' অর্থাৎ ছোট-বড়, খারাপ-ভাল, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট সবই যেখানে একদর অথবা যখন একদর, কিংবা সেই সময়টা মোটেই সুবিধের নয়। মুড়ি-মিছরির একদর হওয়া উচিত নয়।

একালে কিন্তু একথা আর বলা যাবে না।

একদা মুড়ি ছিল সহজলভ্য, গরিবানা খাবার। দামে কম। আর মিছরি ছিল দুর্লভ। দেশের বাইরে থেকে আমদানি করতে হত। অনেকে বলেন, মিশর থেকে আসত বলে মিছরি। যেমন চিন থেকে চিনি, গৌড় থেকে গুড়।

সে যা হোক মিছরি ছিল সে আমলে, মুড়ির তুলনায় অনেক বেশি মহার্ঘ। তার ব্যবহার ছিল বড়লোকের শরবতে আর ঠাকুরঘরের প্রসাদে। দেবভোগ্য মিছরি আর সস্তা মুড়ির একদর হলে আশঙ্কারই কথা।

কিন্তু এখন তো তাই হয়েছে। মুড়ি-মিছরি একদর হয়ে গেছে। দুয়েরই দাম কুড়িটাকা কেজি। কোথাও কোথাও সামান্য কম বা বেশি হতে পারে।

শুধু মুড়ি-মিছরি নয়। প্রৌঢ় পাঠক আরেকটু মনে করুন। আমাদের বাল্যকালে চিকেন বা মুরগির মাংস ছিল দুর্লভ ও দুর্মূল্য। হোটেলে রেস্তোরাঁয়, সাহেব আধাসাহেবদের ডাইনিং রুমে দেখা মিলত এই সুখাদ্যের।

আমাদের মতো ব্রাত্যজনের জন্য ছিল পাঁঠা-খাসির সস্তা মাংস। এই সেদিনও, মাত্র চল্লিশ বছর আগে এই মাংস ছিল দুটাকা-আড়াই টাকা সের। সে জায়গায় একটা আধসেরি দিশি মুরগির দাম পড়ত চার-পাঁচ টাকা।

সব কিছুরই কালক্রমে দাম বেড়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে চালের দাম সবচেয়ে বেশি হয়েছিল টাকা-টাকা সের। এখন তো সদাসর্বদা এর থেকে পনেরো-বিশগুণ দাম দিয়ে চাল কিনতে হয়।

যে বাংলা উপন্যাসের দাম ছিল দুই কিংবা আড়াই টাকা এখন তার দাম ষাট টাকা। আপনি ইস্কুলে দেড় টাকা মাস মাইনে দিয়ে পড়েছেন, আপনার নাতির জন্যে মাস মাইনে সাতশো টাকা।

সাধারণ জিনিস থেকে সোনাদানায় যাই। আমার একটা রেকর্ড আছে। আগে বিখ্যাত সুরের ডায়েরিতে পুরনো দিনের সোনার দামের বিবরণ ছাপা হত। সুরের ডায়েরি বহুমূল্য হয়ে যাওয়ার পর এবং চমৎকার সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ডায়েরি উপহারে সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় আজকাল আর সুরের ডায়েরি দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং জানি না সেই স্বর্ণ বিবরণী এখনও দেওয়া হয় কি না।

আমার কাছে একটা পুরনো ডায়েরি কী করে রয়ে গেছে, সেখানে সোনার দামের একটা হিসেব দেখছি, প্রায় ষাট বছরের মূল্য তালিকা।

১৯৪০ সালে পুজোর সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে এক ভরি গয়নার সোনার দাম পঁয়ত্রিশ টাকা। যুদ্ধের বাজারে দাম ওঠানামা করতে করতে পঁয়তাল্লিশ সালের শেষে সোনার দাম দ্বিগুণ হল। চিন যুদ্ধের সময় বাষট্টি সালে সোনার দাম আবার ডবল হয়ে ভরি প্রতি দাম দাঁড়াল প্রায় সোয়াশো টাকা। বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশ যুদ্ধের ঠিক আগে এক ভরি সোনার দাম প্রায় দুশো টাকায় পৌঁছোল। অবশেষে বাড়তে বাড়তে এখন তো প্রতি ভরির দাম এর পঁচিশ গুণ।

সোনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দুহাজার টাকা বিঘে মানে একশো টাকা কাঠার জমি এখন লক্ষ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

শুধু সোনা বা মাটি নয়, বাড়ি ভাড়া বা গাড়ি ভাড়া নয়, মাছ-মাংস, তরি-তরিকারি, জামা-কাপড়, ওষুধ-ডাক্তার সব কিছুর মূল্য বাড়ছে তো বাড়ছেই।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর এক প্রতিবেদনে একদা চমৎকার বলেছিলেন,

'আগে পকেট ভরা টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে ব্যাগ ভরে জিনিস কিনে আনতাম। এমন দিন আসছে যখন ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে পকেট ভর্তি জিনিস কিনে আনতে হবে।'

ডায়েটিং

ডায়েটিং কথাটার কোনও মানেই ছিল না চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। যে মোটা সে খেয়ে-না-খেয়ে মোটা, যে রোগা সে খেয়ে-না-খেয়ে রোগা। যে মোটা সে না খেয়ে বা ডায়েটিং করে রোগা হওয়ার চেষ্টা করত না, রোগা ব্যক্তিও উলটোপালটা খেয়ে মোটা হওয়ার অধ্যবসায়ে রত হত না।

শিবরাম চক্রবর্তীর 'অল্পবিস্তর' কথামালায় এক স্থূলকায় ব্যক্তিকে যথারীতি মামুলি প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'দাদা কেমন আছেন?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'মোটামুটি ভাল আছি।' এই মোটামুটি শব্দটি ব্যঞ্জনাময়। মোটামুটি দ্বন্দ্ব সমাস, মোটা ও মুটি। মোটার স্ত্রীলিঙ্গ মুটি। সোজাসুজি অর্থ হল, 'স্বামী ও স্ত্রী, মোটা ও মুটি, ভাল আছি।'

একই কায়দায় রোগারুগি বলা যায়। কিন্তু সমস্যা আছে, রোগার স্ত্রীলিঙ্গ রুগি নয়। মুটি শব্দ শিবরামীয়। কিন্তু রোগারুগি (রোগী) সবই এসেছে রোগ থেকে। যে লোকটা রোগা ছিপছিপে কিংবা যে মহিলা তন্বী যাকে বলা হয় স্লিম (slim) তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। কারণ অভিধান অনুসারে রোগ থেকে রোগা।

মোটা লোকদের মহাকবি শেক্সপিয়ার পছন্দ করতেন না। জুলিয়াস সিজার নাটকে স্বয়ং সিজার বলেছিলেন, 'Let me have fat men around me.' সম্রাট সিজার তাঁর দুর্দিনে তাঁর চারপাশে মোটা লোকদের রাখতে চেয়েছিলেন। সিজারের বক্তব্য ছিল, রোগা মানুষেরা বিপজ্জনক, তাদের দৃষ্টি শীর্ণ এবং ক্ষুধার্ত, তাদের চিন্তাধারা জটিল।

শেক্সপিয়ারের চরিত্রদের বাণীগুলি শেক্সপিয়ারের বাণী বলেই সমাজে প্রচলিত। বেদ-বাইবেলের মতো শেক্সপিয়ারের বাণী। সব সময়ে ধরে নেওয়া হয় এটাই ধ্রুবসত্য। মানুষ সম্পর্কে এটাই শেষ কথা।

যাঁরা দৈনিক দুবেলা দুঘণ্টা হাঁটেন বা জগিং করেন বা দৌড়োন রোগা হওয়ার জন্যে, যাঁরা চায়ে চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, দই-মিষ্টি-ঘি খাননি মাসের পর মাস, এমনকী ভাত ঘি দিয়ে মেখে আলুভাজা দিয়ে খাননি, মাঘ মাসে টোপাকুলের চাটনি খাননি, বিয়েবাড়িতে সবাই যখন বিরিয়ানি-কাবাব খেয়েছে তখন যিনি বুফে থেকে শুধুমাত্র এক চামচ সাদা ভাত আর একটু সবজি তুলে খেয়েছেন—তিনি বা তাঁরা এসবই করছেন রোগা হওয়ার আহ্লাদে।

কিন্তু রোগা হওয়া কাকে বলে। একজন সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা মানুষের ওজন যদি সত্তর কেজি হয় তাকে খুব একটা মোটা লোক বলা যাবে না। স্বাস্থ্য বইয়ের তালিকা অনুযায়ী পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতার মানুষের পক্ষে এটা ভাল ওজন। কিন্তু একজন পাঁচ ফুট উচ্চতার লোকের পক্ষে এটা খুব বেশি ওজন। তাকে ওজন কমাতে বলবেন ডাক্তারবাবু বা ডায়েটিশিয়ানরা। এই রকম আমার এক বন্ধুকে, যাঁর ওজন বাহাত্তর কেজি কিন্তু উচ্চতা মাত্র পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি তাঁকে ডায়েটিশিয়ান বলেছিলেন, 'হাইট

অনুযায়ী আপনার ওয়েট খুব বেশি। এক্সারসাইজ করতে হবে, ডায়েটিং করতে হবে।'

আমার বন্ধু মানেননি। তাঁর বক্তব্য হল, 'আমার বাহাত্তর কেজি ওজন মোটেই বেশি নয়। আশেপাশে কত লোকেরই তো সত্তর-বাহাত্তর থেকে আশি-নব্বই কেজি ওজন। আসলে সমস্যা হয়েছে আমার হাইট নিয়ে, হাইটটা কম। আমার হাইট যদি সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি, পৌনে ছয় ফুট, ছয় ফুট হত, আপনিই আমাকে রোগা বলতেন।'

রোগা-মোটা নিয়ে বাদ-বিসম্বাদের অন্ত নেই। সদাসর্বদা যে ডায়েটিং কার্যকর হয় তা নয়।

এক স্থূলোদর ব্যক্তিকে ডাক্তারবাবু ডায়েটিংয়ের চার্ট করে দিয়ে বলেছিলেন, একমাস এটা খান। পরের মাসে আসুন, দেখি কী উন্নতি হয়।

পরের মাসে সত্যিই খুব উন্নতি হয়েছে, ডাক্তারবাবু দেখেন রোগীর ওজন চার কেজি বেড়ে গেছে। ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'সে কী আপনি আমার ডায়েটিং চার্ট মেনে চলেননি?' রোগী বললেন, 'চলেছি। কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছে। এমনিতেই আমি বেশি খাই, সেই খাওয়ার ওপরে আবার এই ডায়েটের খাবার, শরীর কেমন আইঢাই করে।'

বই, বইমেলা ও আমি

কোনও গল্প, নিবন্ধ কিংবা বইয়ের এত লম্বা নাম দেওয়া আমার পছন্দ নয়। আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সব রচনা, সামান্য সব বই সেগুলোর বড় কিংবা রাশভারী নাম মানায় না।

তবু এই রচনার নাম কেন লম্বা হল?

শুধু 'বইমেলা' নাম হলেই তো হত। কিন্তু 'বইমেলা' নামে অদ্যাবধি আমি অন্তত দশটা রচনা লিখেছি, যেমন লিখেছেন আর দশজন সাধারণ বাঙালি লেখক, এমনকী, আমি আবিষ্কার করলাম 'বইমেলা ও আমি' নামে আমি গতবছরেই দুটো রচনা লিখেছি। সবচেয়ে বড় কথা, দুটো লেখাই একই দিনে (বইমেলা উদ্বোধনের দিনে) দুটি দৈনিকে ছাপা হয়েছিল। তবে কবুল করছি, দুটো এক লেখা নয়; খুব আলাদাও নয়। একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা, যেমন আমার লেখা হয়ে থাকে।

সে যা হোক, আবার যখন লিখতে হচ্ছে, দু-একটা পুরনো কথা বলি।

কলকাতা বইমেলা নামে পরিচিত যে সাংবাৎসরিক দশদিনব্যাপী অনুষ্ঠান, যার আসল নাম 'কলিকাতা পুস্তক মেলা' তথা Calcutta Book Fair (হয়তো এবার Kokata Book Fair), সেই গ্রন্থপাঠনের প্রথম বছর থেকে আমি এই মেলার অনুগ্রাহক।

বইমেলার সেই প্রথম যুগে তখন আমি নিতান্তই এক অর্ধসফল কবি, দু-চার পাতা গদ্য কখনও কদাচিৎ লিখি, তারও অধিকাংশই শিশুসাহিত্য। মোট কথা তখনও আমি গ্রন্থকার বলে পরিচিত নই। সুতরাং বইমেলায় সে সব সময়ে আমি ছিলাম নিতান্তই এক পদাতিক। সে সময়ে সাহিত্যসভা, গল্পপাঠ কিংবা কবি সম্মেলন খুব একটা ছিল বলে মনে হয় না, থাকলেও আমাকে কখনও কেউ ডাকেনি।

প্রসঙ্গত বলি, বইমেলার কোনও লাঞ্চ, ডিনার বা পার্টিতে অদ্যাবধি আমাকে কখনও ডাকা হয়নি। কখনও কোনও নিমন্ত্রণ আজ পর্যন্ত পাইনি।

এখন অবসরজীবনে সল্টলেকের অজ্ঞাতবাসে থাকি, এ রকম নিমন্ত্রণ পেলে, যেতে পারি বা না পারি, আহ্লাদিত বোধ করি।

অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে, এতসব নামজাদা লেখক, অধ্যাপক, পণ্ডিতজনের মধ্যে আমাকে কেন ডাকা হবে। আমি লোকটা কে? উত্তর একটাই, আমি একজন লেখক। বইমেলা বইয়ের মেলা, পরিষ্কার ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। প্রতি বছর বইমেলায় আমার অন্তত পাঁচ-সাতটা বই বেরোয়। সেগুলো প্রকাশ করেন বিশিষ্ট প্রকাশকেরা, যাঁদের অনেকেই বইমেলার কর্মকর্তা। আমার মতো লেখকদের বই নিয়েই বইমেলা। তবু আসল সত্য কথা হল একজন আমলা, পুলিশ অফিসার বা মন্ত্রীকে বইমেলা যতটা খাতির করে অধিকাংশ লেখককে তা করে না। করে না কারণ, না করলেও চলে, একজন চাষি বা তাঁতিকে শস্যবণিক বা বস্ত্রবণিক যতটা গুরুত্ব দেন, পুস্তক-বণিকেরা একজন লেখককে তার থেকে বেশি গুরুত্ব কেন দেবেন? বাজার অর্থনীতির এটাই চেহারা।

এবং এটাও সত্যি কথা আমি তো নিজে অন্তত কবিতা বাদে বাকি প্রায় সব রচনাই অর্থলোভে লিখি। আর কিছু চাইব কেন? অর্থই আমার পরম প্রাপ্তি।

সে যা হোক, বইমেলা বিষয়ক কোনও ব্যাপার নিয়ে অভিমান করা আমার উচিত নয়। সেটা অন্যায় হবে।

বইমেলা আমাকে অনেক দিয়েছে। আমি যে লেখক তথা গ্রন্থকার হিসাবে যৎসামান্য স্বীকৃতি পেয়েছি, সে এই জনতার আদালতে বইমেলার জন্যে। অবশ্য বইমেলা বলতে শুধু কলকাতা ময়দানের বড় মেলাটিই নয়, এখন গ্রামেগঞ্জে, মফস্বলে, প্রবাসে যে সব বইমেলা হচ্ছে সবগুলির কথাই বোঝাচ্ছি।

বইমেলার এখন ভ্রাম্যমাণ চেহারা। আজ সিঙ্গুরে, কাল মাথাভাঙায়, সামনের সপ্তাহে গৌহাটিতে, এর আগে ওপারে ঢাকায় এবং দিল্লিতে। অনেক সময় একই সময় একাধিক জায়গায় মেলা হয়।

যাত্রাগানের মতোই বইমেলার এখন একটা মরশুম তৈরি হয়েছে। ধরে নেওয়া যায় বিজয়া দশমীর পর থেকে একেবারে পঁচিশে বৈশাখ পর্যন্ত শহর, শহরতলি, মফস্বলে বইমেলা ঘুরে ঘুরে হচ্ছে। সেই সঙ্গে আর দশজনের মতো আমার বইও পাঠকের কাছে পৌঁছোচ্ছে।

আমি সেই ধরনের লেখক যাকে প্রচারমাধ্যম কখনওই প্রশ্রয় দেয় না, তেমন করে হইহই করে আমার বইগুলোর বিজ্ঞাপনও হয় না প্রথামতো, সাধারণভাবে যেটুকু প্রচার না হলে নয় তার চেয়ে বেশি হয় না। গ্রন্থ সমালোচকেরা (আজকাল সমালোচিকাই বেশি) প্রায় কখনওই আমার জন্যে একবিন্দু কালি খরচ করেননি। পুরস্কার বিধাতাবৃন্দ কখনওই আমাকে জলচল ভাবেননি, তাঁদের কাছে আমি অস্পৃশ্য।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সম্পাদক আমার লেখা ছাপেন, সেই লেখা প্রকাশক গ্রন্থাকারে বার করেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিক্রিও হয়।

এসবই বইমেলার কল্যাণে। পাঠকেরা সরাসরি আমার বই দেখে কেনেন। কোনও বিজ্ঞাপন, প্রশংসাপত্র, কোনও প্রাতিষ্ঠানিক উৎসাহ আমাকে সাহায্য করে না। বইমেলার দৌলতে পাঠকের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র লেখকের যোগাযোগ ঘটে।

বইমেলা যুগ-যুগ জিয়ো।

একথা সত্যি যে বইমেলা না থাকলে আমার অস্তিত্ব, লেখক হিসেবে আমার অস্তিত্ব, বিপন্ন হত। বইমেলার জন্যেই আমার লেখকজীবন চলছে। পাঠকেরা আমাকে হাতের কাছে পাচ্ছেন।

তাঁরা যাতে আমার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে যোগাযোগ করতে পারেন সেই জন্যে আমি আমার প্রায় প্রতিটি বইয়ে বাড়ির ঠিকানা দিই। চিঠিপত্রে তাঁদের মনোভাব কিছুটা টের পাই।

কলকাতা বইমেলা কলকাতা ময়দানের মধ্যেই গত দুই দশকে চার-পাঁচবার স্থান বদল করেছে। শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রসদনের উলটো দিক থেকে তারপর এগোতে এগোতে বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতভূমি পার হয়ে ব্রিগেড প্যারেডমুখী মাঠে নেমে এসেছিল। এখন কয়েকবছর হল চৌরঙ্গি এবং রেড রোডের মধ্যে তার অবস্থান হয়েছে। জায়গাটা ভাল, পাতাল রেলের গা-ঘেঁষা, তা ছাড়া এখন বনবীথি হয়ে মনোরম হয়েছে।

কখনও কখনও শুনতে পাই বইমেলা নাকি একটা পাকাপোক্ত দালানে, ই এম বাইপাসে বা ওই রকম কোথাও পাকাপাকিভাবে উঠে যাবে। কিন্তু সেটা কি ভাল হবে? মেলার পরিবেশ না থাকলে বইমেলা জমবে না।

তা, এতক্ষণ তো লেখক-প্রকাশক জড়িত বইমেলার কথা হল। এবার একটু হালকা হওয়া যেতে পারে। বই কেনাবেচার কথা একটু বলি।

সৈয়দ মুজতবা আলি এক ভদ্রমহিলার কথা বলেছিলেন যিনি তাঁর বাড়িতে একটি বই আছে বলে আর দ্বিতীয় বই খরিদ করার কথা ভাবেন না। অবশেষে তিনি একদিন দ্বিতীয় বই কিনতে এলেন। দোকানদার অবাক, 'সে কী ম্যাডাম দুটো বই হয়ে গেল যে!'

ম্যাডাম বললেন, 'আগের বইটা আমার স্বামীর। আমার জন্মদিনে একটা টেবিল ল্যাম্প পেয়েছি, সেই ল্যাম্পে পড়বার জন্যে এই দ্বিতীয় বইটা কিনলাম।'

তবে বেশি বই কেনা (বা যেনতেন সংগ্রহ করা) খুব ভাল কাজ নয়। বই জমে জমে পাহাড় হয়ে যায়, গোছানো হয় না, পড়া হয় না। এমনকী অনেক সময় খেয়ালই থাকে না কোন বই কিনেছি, কোন বই কিনিনি।

বইমেলার কাউন্টারে দেখেছি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর গবেষণায় রত, 'এই বইটা কি আমাদের আছে? গত বছর কি কিনেছিলাম?'

এ বিষয়ে সবচেয়ে মূল্যবান কথা বলেছিলেন এক বৃদ্ধ সর্দারজি ট্রাক ড্রাইভার।

আমি বাড়ি বদল করছিলাম। একাধিক ট্রাকে প্রচুর জিনিসপত্র তোলা হয়েছে, তার মধ্যে একটিতে অর্ধেকের বেশি বই। সেই বইগুলি ট্রাকে তাক করে সাজাতে সাজাতে সর্দারজি বললেন, 'এত বই?'

আমি বললাম, 'পনেরো বছর এ বাড়িতে আছি, ধীরে ধীরে জমে গেছে।'

সর্দারজি বললেন, 'পনেরো বছরেও পড়ে উঠতে পারেননি বইগুলো? তা হলে এখন কী আশায় নিয়ে যাচ্ছেন? এবার পড়ে ফেলবেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি। এবারও যখন বইমেলায় দেখব লোকেরা গাদাগাদা বই কিনছেন, মনে প্রশ্ন জাগবে, 'গত বছরের বইগুলো পড়া হয়ে গেছে তো?'

কিন্তু তাতে আমার কী আসে যায়?

আমার বই বিক্রি হলেই হল।

বইমেলায় গঙ্গারাম

১
উদ্বোধন/প্রথম দিন

বইমেলা।

কে যেন বলেছিলেন বইমেলা মানে মেলাবই।

এমনিতে সরাসরি ব্যাকরণগতভাবে বইমেলা হল ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, যার ব্যাসবাক্য হল বইয়ের মেলা।

অবশ্য আমরা যতই বইমেলা, বইমেলা বলি, এখনও কিন্তু আনুষ্ঠানিক নাম 'পুস্তকমেলা', শুধু পুস্তকমেলা নয়, 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'। মুখে মুখে পুস্তকমেলা কবে বইমেলা হয়ে গিয়েছে। তবে এবারের নিমন্ত্রণপত্রে দেখছি এখনও 'কলিকাতা আছে কলিকাতাতে', লেখা হয়েছে 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'।

কেমন খটকা লাগে মানে। ক্যালকাটা যদি কলকাতা হয় তিনশো বছরের অঙ্ক পালটিয়ে দিয়ে, তবে কলিকাতা কেন কলকাতা হবে না?

গতকাল ছিল বইমেলার উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আজ বইমেলার প্রথমদিন।

গঙ্গারাম বইমেলায় এসেছে। সে প্রত্যেকবার প্রতিদিনই আসে, এবারও সেটা চেষ্টা করবে। তবে সে গতকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যায়নি। সেখানে প্রবেশের অনেক বিধি নিষেধ। সে এদিক-ওদিক ঘুরেছিল।

উদ্যোক্তারা তারাপদ রায়কে দুটি আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন, মেলার সবকয়টি দিনের জন্যে, কিন্তু তার মধ্যে লেখা আছে এই আমন্ত্রণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য নয়। তারাপদ রায় তাঁর একটি কার্ড গঙ্গারামকে দিয়েছেন, কিন্তু তাতে কোনও সুবিধে হচ্ছে না। গ্রন্থমেলার মধ্যে রাষ্ট্রপতি থেকে মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ থেকে ব্যবসায়ী সবাই স্বাগত, অভিনন্দিত, শুধু সেখানে, এমনকী অনুষ্ঠান সভায় গ্রন্থলেখক বা পাঠকের তেমন কোনও স্থান নেই, অথচ তাদের জন্যই এই বইমেলা।

সে যা হোক, আজ অর্ধসমাপ্ত বইয়ের স্টলগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে অনেক চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এলোমেলো চুল, উদাসীন দৃষ্টি, কাঁধে একটি বইভর্তি ঝোলা গঙ্গারামের পরিচিত এক তরুণ কবি সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। বইয়ের ভারে তার পিঠ নুয়ে আছে। গঙ্গারামকে দেখে সে দাঁড়াল, এই বইমেলাতেই তার একটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। গঙ্গারাম তাকে দেখে প্রশ্ন করল, 'কী হে এই বয়সেই বুড়োবুড়ো ভাব, কুঁজো হয়ে যাচ্ছ কেন?'

সে বলল, 'কী বুঝবেন গঙ্গাদা, আমার ওপর যত দায়িত্ব পড়েছে।'

গঙ্গারাম বলল, 'কীসের দায়িত্ব?'

কবি বলল, 'রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ নেই। শক্তিদাও নেই। বিনয় মজুমদার পাগল হয়ে গেছেন। অরুণ মিত্রও মারা গেলেন। সুনীলদা উপন্যাস লিখছেন। তারাপদদা রসসাহিত্যিক হয়ে গেছেন। বাংলা কবিতার পুরো বোঝাটা এখন এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে।' এই বলে, সে তার কাঁধের ওপর নিজের বইয়ের বোঝার ওপরে তাকাল।

২
অদ্বিতীয়

আজ বৃহস্পতিবার।

বইমেলার দ্বিতীয় দিন।

অন্যান্য বছর বইমেলা জানুয়ারি মাসের শেষ বুধবার থেকে শুরু হয়। এবার একদিন আগেই উদ্বোধন হয়েছে।

অবশ্য বইমেলা এখনও তেমন জমেনি। এখনও ইলেকট্রিকের কাজ হচ্ছে কোনও কোনও স্টলে, বইপত্র আসছে টেম্পো করে। যে সব দোকান চালু হয়েছে সেখানেও কেনাকাটা খুব বেশি নয়।

প্রত্যেক বছর যেমন হয় এবারও মেলা জমতে জমতে শনিবার-রবিবার হয়ে যাবে। আপাতত একটু ছাড়াছাড়া ভাব। লোকজন ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে।

বইমেলার মূল দরজা থেকে যে রাস্তাটা সোজা দক্ষিণমুখী চলে গেছে, তারই প্রথম মোড়টায় একটু লোকজন আছে। সেখানে আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, গায়ে পুরনো চাদর এক ভদ্রলোক ভিক্ষে করছেন।

গঙ্গারাম তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি হাত বাড়িয়ে গঙ্গারামকে বললেন, 'দুদিন খাওয়া হয়নি দাদা। যদি একটা টাকা দিয়ে যেতেন।'

গঙ্গারামও যেমন, সে বলল, 'দুদিন খাননি, এখন এক টাকায় কী খাবেন, এক ঠোঙা ঝালমুড়ি কিংবা চিনেবাদামও তো পাবেন না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'না দাদা। খাওয়ার জন্য টাকাটা চাইনি। একটা এক টাকার কয়েন পেলে ওজন নিতাম।'

'ওজন নিতেন?' বিস্মিত গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করল।

ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে বললেন, 'দুদিন খাওয়া হয়নি তো, তাই একটা একটাকার কয়েন দিয়ে ওজনের মেশিনে উঠে দেখতে চাই ওজন কতটা কমল।'

এ রকম অদ্ভুত কথা শুনে গঙ্গারাম ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে ভদ্রলোককে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল। গঙ্গারাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আপনিই সেই লেখক তো যিনি গতবছর বইমেলায় 'উপার্জনের একশো উপায়' বইটি বিক্রি করেছিলেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'তাই কী হয়েছে?'

গঙ্গারাম বলল, 'এবার ভিক্ষে করছেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'তাতে কী হয়েছে। ভিক্ষে করাও উপার্জনের একশো উপায়ের মধ্যে পড়ে।'

৩
তেরাত্তির

আজ শুক্রবার।

বইমেলার তৃতীয় দিন। আজ রাত্রি কাটলে বইমেলার তেরাত্তির কাটবে।

তেরাত্তির কথাটা ভাল নয়, খারাপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবু বইমেলার ওপর দিয়ে এ যাবৎ এত ঝড়ঝঞ্ঝা, অগ্নিকাণ্ড, মারামারি হাতাহাতি হয়ে গিয়েছে, প্রথমেই তেরাত্তির কথা মনে পড়ে।

আজও মেলা তেমন জমেনি। খাবারের দোকানের সংখ্যা কম হওয়া এর কারণ হতে পারে। আবার এও মনে হচ্ছে কাল শনিবার থেকে ভিড় বাড়বে, বইমেলা জমজমাট হবে।

ইতিমধ্যে মাছভাজার দোকান থেকে তন্দুরি, ছবির মেলা থেকে সভাসমিতি যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্যান্য বছরের মতো পথের পাশে ছোটদের রঙিন বই, পঞ্জিকা, হাতে-হাতে ছবি আঁকার শিল্পী, ম্যাজিক ব্যবসায়ী সবাই এসে গেছেন। প্রত্যেক বছরই শোনা যায় এসব জঞ্জাল বইমেলায় রাখা হবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকে যায়।

ইনস্ট্যান্ট পোর্ট্রেট আর্টিস্টের সামনে একটা টুলে বসে গঙ্গারাম নিজের মুখচ্ছবি তৈরি করাচ্ছিল। মাত্র পঁচিশ টাকা। কিন্তু নিজের মুখের ছবি দেখে গঙ্গারাম খুশি হল না। শিল্পীকে বলল, 'দেখুন, আমার মনে আছে, দশ বছর আগে আপনিই আমার একটা ছবি করে ছিলেন, সেটা কত সুন্দর হয়েছিল।'

চতুর আর্টিস্ট বলল, 'স্যার দশ বছর আগে আমার বয়েস দশ বছর কম ছিল।' গঙ্গারামের খেয়াল হল তারও তাই ছিল, সে রকম চেহারা তো তার এখন নেই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গঙ্গারাম সামনের দিকে এগোল।

গঙ্গারাম মাঠের মধ্যখানে ছিল। এখনও টেম্পো, ম্যাটাডোর করে বই আসছে, দু-একটি স্টল অর্ধসমাপ্ত। বইমেলার প্রাঙ্গণে ঘোরাঘুরি খুব নিরাপদ নয়। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে মূল ফটকের সামনে দাঁড়াল।

এক দম্পতি সদ্য ঢুকেছে। তাদের সঙ্গে তিন বছর, দেড় বছর এবং চার মাসের একটি বাচ্চা, কোলে। এর মধ্যে মহিলাটি গঙ্গারামের পূর্বপরিচিতা, সে মহিলাকে গিয়ে বলল, 'অণিমা তোমার বিয়ের পর আজ এই প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হল।'

অণিমা বলল, 'গঙ্গাদা তুমি তো আমার কোনও খবরই রাখ না, এখন আমি একাধিক শিশুর জননী। কোলেরটাকে দেখ, এর প্রায় চার মাস বয়েস।'

হতবুদ্ধি গঙ্গারাম একটি প্রশ্ন করল, 'এটাই কি সবচেয়ে ছোট?'

৪
চেনা অচেনা

আজ শনিবার।

বইমেলায় সাধারণত খুব ভিড় হয় শেষের শনি-রবিবারে। কিন্তু এবার প্রথম শনিবারেই মারকাটারি ভিড় হবে বলে মনে হয়।

আজ আবার গঙ্গারাম তারাপদ রায়কে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তারাপদবাবুর ধারণা সবাই তাঁকে চেনে, কিন্তু গঙ্গারাম জানে তারাপদবাবুকে বিশেষ কেউই চেনে না। সে চিনত কল্যাণগড়ে যেখানে তিনি মাস্টারি করতেন, সে চিনত বোর্ড-অফ-রেভিনিউতে যেখানে তিনি বড়বাবু ছিলেন।

সে বোর্ড-অফ-রেভিনিউও কবে উঠে গেছে, এখন আর এই এতবড় কলকাতা শহরে বড়বাবুদের তেমন খাতির নেই। কবি-লেখকেরা একটু আলাদা খাতির পায় বটে, কিন্তু তারাপদবাবুর নাম দু-চারজন জানলেও, তার চেহারা লোকের চেনা নয়।

তবে অঘটন আজও ঘটে।

'সাহিত্যম' নামে প্রকাশনালয় থেকে তারাপদ রায়ের ১১১টি রম্যরচনার স্বনির্বাচিত সঙ্কলন বেরোনোর কথা, তিনি সেই স্টলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ স্টলের সামনেই এক মহিলা তারাপদবাবুকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

তারাপদবাবুর একটা বিশেষ গুণ হল তাঁকে যেমন কেউ চিনতে পারে না তেমনিই তিনিও কোনও লোককে দেখে সহজে চিনতে পারেন না, যদি না সে খুব চেনা হয়।

আজকেও তাই হল। হাস্যমুখী মধ্যবয়সি মহিলাকে দেখে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল তারাপদবাবুর। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। এঁকে কোথায় দেখেছি এই রকম চিন্তান্বিত মুখে মহিলার দিকে একটু তাকিয়ে তারাপদবাবু বললেন, 'আপনি?'

ভদ্রমহিলা একটু চমকিয়ে গিয়ে, একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বোধহয় আমার ভুল হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার কোনও বাচ্চার বাবা।'

এ ধরনের অভিযোগ শুনে তারাপদবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, এ কী পরিহাস রে বাবা।

তারাপদবাবুর অবস্থা দেখে গঙ্গারাম বলল, 'আপনি এত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন কেন?'

তারাপদবাবু বললেন, 'শুনলে না, ভদ্রমহিলা বললেন, আমি বোধহয় তাঁর কোনও বাচ্চার বাবা। কী সাংঘাতিক কথা। আমি ঘরগৃহস্থী মানুষ, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নির্ভেজাল সংসার করি।'

তারাপদবাবুর কথা শুনে গঙ্গারাম হেসে ফেলল, 'ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারেননি। পাঠভবনে শিক্ষিকা ছিলেন। আপনার ছেলে কৃত্তিবাস মানে তাতাই তো ওঁর কাছেই নার্সারিতে পড়েছে। তা হলে ওর একটা বাচ্চার আপনি বাবা।'

৫
ক্যাঙারু

ক্যাঙারুদের মনে পড়ে?

সেই যে সামনের দুটো পা (অথবা হাত) নুলো মতন, পিছনের দুটো পায়ে থপথপিয়ে চলে, ঘাসপাতা খায়, বিচিত্র এক নিরীহ জন্তু। ভগবান দয়া করে ক্যাঙারু মায়ের বুকে একটা একটা করে চামড়ার পকেট করে দিয়েছেন, বাচ্চা রাখার জন্যে। ক্যাঙারু শিশু পরমানন্দে মায়ের বুক পকেটে বড় হয়।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় এখন অনেক ক্যাঙারু। গঙ্গারাম কথামালা পড়তে পড়তে যদি কারণে বা অকারণে কারও এই হাস্যকর জন্তুটির কথা মনে পড়ে, পরের দিন বইমেলা আসার পথে না হয় চিড়িয়াখানা ঘুরে এলেন।

অবশ্য চিড়িয়াখানায় না গেলেও চলে। আজকাল জীবজন্তুরাই বইমেলায় চলে আসছে।

এই তো গতকালকেই শনিবারের উথাল-পাতাল ভিড়ের মধ্যে এক ক্যাঙারু দম্পতি ঘুরে ঘুরে, ভিড় ঠেলে, লাইন দিয়ে বইমেলা দেখছে।

ক্যাঙারু দম্পতির ঠিক পাশে পাশেই ছিল গঙ্গারাম। হঠাৎ সে দেখল বাবা-ক্যাঙারু মা-ক্যাঙারুকে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'খোকা কোথায়?' খুব কাঁচুমাচুভাবে নিজের বুক পকেট হাতড়িয়ে মা-ক্যাঙারু বলল, 'কই, খোকাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

এই কথা শুনে বড় ক্যাঙারু লাফিয়ে উঠল, 'সর্বনাশ! তা হলে তো খোকা পিকপকেট হয়ে গেছে।'

আজ রবিবার সকালে এই গল্পটা তারাপদবাবুকে গঙ্গারাম আরও একটু বলল।

তারাপদবাবু কিন্তু গঙ্গারামকে পাত্তা দিলেন না। বললেন, 'তুমি আমার পুরনো গল্প আমাকে শোনাচ্ছ। তা শোনাও কিন্তু আবার লিখতেটিখতে যেয়ো না।'

গঙ্গারাম বলল, 'এসব গল্প কি কখনও কারওর নিজের হয়? আপনিও নিশ্চয় অন্য কোথাও থেকে টুকে লিখেছিলেন।'

নিরুত্তর তারাপদবাবু নীরবে গঙ্গারামের অভিযোগটি হজম করলেন।

৬
ষষ্ঠী

দেখতে দেখতে বইমেলার ছয় দিন হয়ে গেল। মেলা এখন ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়।

বইমেলায় কিছু লোক থাকে যারা কাজেকর্মে দৈনিক যায়, দৈনিক যেতে হয়। আরও বেশ কিছু দর্শক থাকে যারা আড্ডা দিতে কিংবা নিতান্তই হইহুল্লোড়ের জন্যে বইমেলায় প্রায় সব কয়দিনই হাজিরা দেয়।

এর বাইরে কিছু লোক আছেন যাঁরা একাকী কিংবা বন্ধুবান্ধবের (অনেক ক্ষেত্রে প্রাণের বান্ধবীর) সঙ্গে কিংবা সপরিবারে মেলায় প্রতি বছরে একবার আসেন। প্রায় মহালয়ায় গঙ্গাস্নানের মতো রিচুয়াল। এ জাতীয় দর্শকের সংখ্যাই বেশি। এদের মধ্যে অর্ধেকের বইমেলা এবারের মতো দেখা হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক দেখবে পরের ছয় দিনে।

এবারে অবশ্য আজকের দিন ধরে সাত দিন হল। এবারের বইমেলা তেরোদিন। বারোদিন মেলা আর একদিন উদ্বোধন। উদ্বোধনের প্রথম দিনে কাজকর্ম, কেনাবেচা প্রায় কিছুই হয় না তাই সেটাকে বাদ দিয়ে হিসেব। তবে যোগ দিয়ে মোটমাট মেলার দিন হয়েছে তেরো। তেরোর গেরো বলে একটা কথা আছে। ইংরেজিতেও থার্টিন একটা অশুভ সংখ্যা। কিন্তু বইমেলার উদ্যোক্তারা এই কুসংস্কার তোয়াক্কা করেননি এবং না করে ভালই করেছেন। বইমেলা দীর্ঘায়ু হোক।

আর কিছু না হোক বইমেলার দিন তো একটা বাড়ছে।

আজ সকালবেলা গঙ্গারাম তারাপদবাবুর সঙ্গে এসব বিষয়ে গল্প করছিল।

তারাপদ রায় সব শুনে বললেন, 'রাশিবিদ্যাকে, অঙ্ক বানীকে এতটা অবহেলা করা উচিত নয়।'

গঙ্গারাম বলল, 'সেকী? আপনিই না বলেন সব খোলামন নিয়ে বিচার করতে। মনে কোনও কুসংস্কার রাখবেন না।'

তারাপদ রায় বললেন, 'তা হলে আগে একটি ঘটনা শোনো। একই ঘটনা বটে তবে দুটো গল্প।

সেদিন রানীরহাটে গেছি মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে কবি সম্মেলনে। সম্মেলনের পাশেই একটি গ্রাম্য মেলা। সেখানে সংখ্যা নিয়ে জুয়ো খেলা হচ্ছে। একটি সংখ্যার ওপরে বাজি ধরে টাকা রাখতে হবে, তারপর চাকা ঘুরিয়ে নম্বরটি মিললে পরে দশগুণ টাকা পাওয়া যাবে, হারলে গচ্চা। এক নবদম্পতি জুয়ো খেলছে। স্বামী স্ত্রীকে বললেন, তোমার যা বয়েস সেই সংখ্যার ওপরে বাজি রাখো। স্ত্রী সাতাশ সংখ্যা ধরলেন, উঠল ছত্রিশ।

এরপরে সেকী দাম্পত্য কলহ। স্বামী বললেন, তোমার আসল বয়েস ওই ছত্রিশ। ছত্রিশ ধরলে টাকাটা পেতাম। স্ত্রী কোনও জবাব দেন না। হাপুস কাঁদেন।...'

গল্প থামিয়ে দিয়ে গঙ্গারাম বলল, 'এ তো একেবারে পুরনো, রদ্দি। আপনি আগে লিখেছেন। বইমেলার নতুন গল্প বলুন।'

চাপে পড়ে তারাপদ রায় বললেন, 'আগামী কাল বইমেলার গল্প।'

৭
কাদের কুলের বউ

বইমেলা আজ সাতদিন হয়ে গেল। গত বুধবার আরম্ভ হয়েছে। আজ পরের সপ্তাহের মঙ্গলবার। মাত্র পাঁচদিন বাকি আছে বইমেলা শেষ হওয়ার।

হইচই, আনন্দ, কলরব। কত পুরনো লোকের সঙ্গে ফিরে দেখা, কত নতুন লোকের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়।

বইমেলার সময় কলকাতার মেজাজই আলাদা। নাতিশীতোষ্ণ দিন, ঈষৎ শীতল রাত্রি। সহসা হু হু করে এক ঝলক দখিনা বাতাস বয়ে আসে ময়দানে ভিড়ে ভরা বইমেলায়।

বইমেলার একটা মাদক আকর্ষণ আছে। কিন্তু পরপর ছয়দিন গিয়ে আজ গঙ্গারাম একটু ক্লান্ত। সে আজ সন্ধ্যাবেলা তারাপদবাবুর বাড়িতে এসেছে। তা ছাড়া গতকালই তারাপদবাবু কথা দিয়েছেন যে আজ বইমেলায় একটা নতুন গল্প বলবেন।

এ ব্যাপারে তারাপদ রায় পিছপা নয়। তিনি এক পেয়ালা চা খেতে খেতে শুরু করলেন—

...ঘটনাটা গত বছরের। অনিমেষ অধিকারীকে চেনো তো? উদীয়মান তরুণ কবি। কিন্তু অল্প বয়েস থেকেই ছোকরার চোখ খারাপ। দুই চোখে প্লাস পাওয়ারের মোটা কাচের চশমা, চোখ থেকে চশমা খুললে কিছুই দেখতে পায় না। সব ঝাপসা ঝাপসা।

তা এই অনিমেষের অঘ্রাণের শেষে বিয়ে হয়েছে। তার বউ দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ি গিয়ে পৌষ মাস কাটিয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসছে। মাত্র দুদিন আগে এসেছে। এখনও নতুন

বউয়ের সঙ্গে জান-পয়চান সড়গড় হয়নি। সে যা হোক আজই মহিলাকে সঙ্গে করে অনিমেষ বইমেলায় এসেছে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নববধূর কিছুটা আলাপ পরিচয় হয়ে যাবে।

অনিমেষের বাড়ি বইমেলা থেকে হাঁটাপথ। পার্ক স্ট্রিট পেরিয়ে রাসেল স্ট্রিটের একপাশে একটা পুরনো গলিতে জরাজীর্ণ 'অধিকারী হাউস'। উঠোন, বাগান, বারান্দাওলা সাবেক বাড়িটি অনিমেষের বিধবা মা প্রমোটারদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বহু কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সেদিন বইমেলায় প্রচণ্ড ভিড়, ধাক্কাধাক্কি। প্রায় গোহাটার মতো। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তেমন দেখা হল না। কোনও রকমে ঠেলাঠেলি করে বউকে নিয়ে মেলা থেকে বেরোতে গিয়ে অনিমেষের চোখের চশমা খুলে পড়ে গেল। সেই চশমা কুড়োতে গিয়ে অনিমেষ ভূলুণ্ঠিত হল, চশমাও উদ্ধার হল না। কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়ে, নববধূর হাত শক্ত করে ধরে অনিমেষ প্রায় অনুমানে গেট পেরিয়ে, চৌরঙ্গি পেরিয়ে পার্ক স্ট্রিট ধরে রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছোল।

অনিমেষের মা ছেলে বউয়ের জন্যে অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু বউকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন, অনিমেষের দিকে তাকাতে দেখলেন তার চোখে চশমা নেই। বৃদ্ধা রীতিমতো ডুকরিয়ে উঠলেন, ওরে খোকা, তোর বউ কোথায়? এ কাদের বউ তুই বইমেলা থেকে নিয়ে এলি?...

তারাপদবাবু থামতে গঙ্গারাম বলল, গল্পটা সত্যি?

তারাপদ রায় বললেন, গল্প নয়, ঘটনা।

৮
ও বিদেশি বই

কয়েক বছর আগে 'শাতিল আরবের তীরে' নামে একটি বই বিলাতে আমেরিকায় খুব বিখ্যাত হয়েছিল।

কলকাতার একটি ইংরেজি কাগজে বইটির সমালোচনা এবং অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ পাঠ করে গঙ্গারাম বইয়ের বাজারে অনেক খোঁজ করেছিল, কিন্তু 'শাতিল আরবের তীরে' গ্রন্থটি পায়নি।

এদিকে তারাপদ রায় আবার বিদেশি বই থেকে টুকে লেখার মাতব্বর, তিনিও গঙ্গারামকে বারবার বলেছেন, 'বইটা কলকাতার বাজারে আসবে না?'

'শাতিল' আরব দেশের একটি প্রাচীন পবিত্র নদী। ভারতের গঙ্গানদীর মতোই। 'শাতিল আরবের তীরে' মূল গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচিত। এই পৌরাধুনিক (পৌরাণিক + আধুনিক) ইতিন্যাস (ইতিহাস + উপন্যাস) লেখিকা অ্যাংলো-আরব যুবতী, অক্সফোর্ড নাকি বার্কলে কোথাকার ডক্টরেট কিন্তু লিখেছেন মাতৃভাষায়।

এদিকে এবার বইমেলায় ঘুরতে ঘুরতে এক বিকেলে গঙ্গারাম বইটি দেখতে পেল ইন্দ্রনাথ মজুমদারের নতুন-পুরনো বইয়ের দোকান সুবর্ণরেখায়। বইটি বেশ মোটা, প্রথম অর্ধেক আরবি ভাষা, দ্বিতীয় অর্ধেক ইংরেজিতে। ইতিপূর্বে যিনি বইটি পাঠ করেছেন তিনি খুবই যত্ন করে পড়েছেন। আরবি অংশের মার্জিনে সুন্দর হস্তাক্ষরে ছোট ছোট হরফে কাহিনীর ইংরেজি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে রেখেছেন। বইয়ের শেষে ইংরেজি অংশ

সেটা পুরোপুরি অনুবাদ নয়, গ্লসারি, নোটস, মন্তব্যাদি।

হয়তো কোনও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে বইটি পাঠ্য, সেখান থেকে হাত ঘুরতে ঘুরতে কলকাতার সুবর্ণরেখার তাকে পৌঁছেছে। ইন্দ্রনাথবাবু তারাপদ রায়ের অভিভাবক স্থানীয়, তাঁকে গিয়ে গঙ্গারাম বলল, 'তারাপদদা এই বইটা খোঁজ করছিল।'

ইন্দ্রনাথ বইটা হাতে নিয়ে একটু উলটেপালটে দেখে তারপর বইটা গঙ্গারামের হাতে দিয়ে বলল, 'তারাপদকে বইটা তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে বলবে। তারাপদ এখনও টোকার অভ্যেসটা ছাড়তে পারল না?'

বইটি পড়ে কিন্তু তারাপদ রায় অভিভূত হয়ে গেলেন। এ রকম বই তিনি জীবনে পড়েননি।

গ্রন্থের প্রারম্ভে নায়কের মৃত্যু, তারপরে শাতিল আরব নদীতে ঝাঁপিয়ে নায়িকার আত্মহত্যা। এরপরে নায়কের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ। তার পরে অধ্যাপনার চাকরিতে কঠোর জীবন সংগ্রাম। তারও পরে অধ্যাপনার চাকরি সংগ্রহ। এরও পরে পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট। নায়কের পিতার বজ্রপাতে মৃত্যু, এই সময়ে নায়কের প্রেম, বাল্য প্রেম। আরও পরে নায়কের স্কুলে প্রবেশ। অবশেষে গৃহশিক্ষা। বইয়ের সর্বশেষে হামিদ নামক নায়ক জন্মাল।

সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ঘটনা প্রবাহ। মৃত্যু থেকে জন্ম, জন্ম থেকে মৃত্যুই যেখানে নিয়ম। তারাপদ রায় গঙ্গারামকে বললেন, 'লেখিকা এই বইয়ে সর্বকালের সীমা অতিক্রম করেছেন।'

গঙ্গারাম শুনে বলল, 'এটা কিন্তু আরবি ভাষার বই', একটু থতমত খেয়ে তারাপদ বললেন, 'তাই কী হয়েছে?' গঙ্গারাম বলল, 'আরবি-উর্দু ভাষা উলটো দিক থেকে পড়ে নিতে হয়। ডাইনে থেকে বাঁয়ে নয় বাঁ থেকে ডাইনে। আপনি সোজা পড়েছেন তাই কাহিনী উলটিয়ে গেছে।'

৯
ইতস্তত

বাংলা শারদীয় গানে নবমীর নিশির কথা আছে। আজ বইমেলার নবমীর নিশি। কিন্তু শারদীয় দুর্গাপুজোর মতো নবমীতে এর শেষ নয়। নবমীর পরেও আরও তিনদিন গড়াবে। অবশ্য উদ্যোক্তাদের ক্লান্তি নেই, দর্শকদেরও বিরাম নেই। দুর্গাঠাকুরের ভাসানের সময় যেমন আওয়াজ ওঠে, 'আসছে বছর আবার হবে', তেমনিই ওখানেও আওয়াজ উঠতে পারে, 'আসছে সপ্তাহে আবার হবে'।

তবে আসছে সপ্তাহে এখানে না থেকে অন্য জায়গায়, যে যার পাড়ায়, গ্রামেগঞ্জে শহরে বইমেলা বসাবে।

বারো দিনেও তারা সন্তুষ্ট নয়।

গঙ্গারামের বন্ধু পরেশচন্দ্র প্রতিদিনই মেলায় যায়। মেলার দিন বাড়ানোয় তার বিশেষ স্বার্থ আছে।

গঙ্গারাম পরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'প্রতিদিন কী করিস? বই কিনিস?'

পরেশচন্দ্র বলেছিল, 'ঠিক কিনি না তবে পড়ি।'

গঙ্গারাম প্রশ্ন করে, 'না কিনে বই পড়িস?'

পরেশচন্দ্র বলেছিল, 'বই কেনার সামর্থ্য কোথায় আমার? মেলার টিকিটের তিনটাকা দিতেই গায়ে লাগে।'

গঙ্গারাম জানতে চায়, 'তবে?'

এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে পরেশচন্দ্র আক্ষেপ করল, 'বইমেলা বারোদিন না হয়ে পনেরো দিন হওয়া উচিত ছিল।'

'হঠাৎ পনেরো দিন কেন? ষোলো দিন নয়, চৌদ্দদিন নয়, পনেরো দিন?' গঙ্গারামের প্রশ্নমালার পটভূমিকায় পরেশচন্দ্র ম্লান হাসি হেসে বলল, 'আসলে হয়েছে জগন্নাথ চৌধুরীর নতুন উপন্যাসটা প্রকাশকের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে দৈনিক পড়ি।'

গঙ্গারাম স্তম্ভিত। বইমেলার প্রকাশকের কাউন্টারের দাঁড়িয়ে উপন্যাস পড়ে?

'কী আর করব?' পরেশ কবুল করে, 'কিন্তু প্রকাশকের দোকানের লোকেরা আমাকে চিনে ফেলেছে। বেশিক্ষণ পড়তে দেয় না। তাই চেষ্টা চরিত্র করে ঘুরে ফিরে দৈনিক এক চ্যাপ্টার পড়ি। বইটার পনেরোটা চ্যাপ্টার। আরও তিনদিন বেশি সময় হলে বইটা শেষ করতে পারতাম।'

গঙ্গারাম স্তব্ধ হয়ে পরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরেশ বলল, 'আজও আধ চ্যাপ্টার পড়েছি। যাই ভিড় বাড়ার ফাঁকে বাকি আধ চ্যাপ্টারটা শেষ করার চেষ্টা করি।'

পরেশ চলে গেল।

গঙ্গারাম লক্ষ করল ইতিমধ্যে মেলায় ভিড় বাড়া আরম্ভ হয়েছে। গেটগুলো দিয়ে পিল পিল করে লোক ঢুকছে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

১০
গঙ্গারামের অভিজ্ঞতা

আজ বইমেলায় গঙ্গারাম একটু সকাল সকাল এসেছে।

বইমেলা শেষ হতে আর মাত্র তিনদিন। কিন্তু এই ভরদুপুরে মেলা তেমন জমেনি। লোকে বিকেলের দিকে ভিড় করবে। তা ছাড়া আগামী কাল ও পরশু শনি বা রবিবার, ছুটির দিনে সবাই মৌজ করে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি করতে আসবে।

বইমেলার সদর দপ্তর ইউবিআই অডিটোরিয়ামের সামনেটা প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। এই সময়টায় কোনও অনুষ্ঠান নেই বলেই বোধহয়।

এখানেই এক ভদ্রমহিলার আসার কথা, মহিলার সঙ্গে কালকেই আলাপ হয়েছে, তিনি গঙ্গারামের পরিচয় জানতে পেরে তাকে বলেছেন যে দুদিন আগের ক্যাঙারুর গল্পটা তাঁর খুব ভাল লেগেছে। মহিলা জানতে চেয়েছিলেন, সত্যি আলিপুর চিড়িয়াখানায় ক্যাঙারু আছে কিনা? সত্যি ক্যাঙারুর পকেট আছে কি না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

গঙ্গারাম যখন বুঝতে পারল যে ভদ্রমহিলা জীবনে ক্যাঙারু দেখেননি এবং দেখতে চান, সে বলল, 'আপনি যদি কাল দুপুর দুটোর সময় ঠিক এখানে আসেন, আমি আপনাকে চিড়িয়াখানায় ক্যাঙারু দেখাতে নিয়ে যাব।'

ভদ্রমহিলা একবাক্যে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি আজ বেপাত্তা। তাঁর নাম,

ঠিকানা, পরিচয়, ফোন নম্বর কিছুই রাখা হয়নি। কিছুক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গঙ্গারাম বিফল মনোরথ হয়ে সামনের দিকে পা বাড়াল।

একটু এগিয়ে গঙ্গারামের পূর্ব পরিচিত এক মাঝারি মাপের পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকের দোকান। গঙ্গারাম সেই দোকানে ঢুকল।

মধ্যবয়েসি ভদ্রলোক গঙ্গারামকে দেখে নিজের টুলটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গঙ্গারামকে বসতে বললেন।

গঙ্গারাম অবশ্য বসল না। দুজনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলল, এ সময়টা খদ্দের প্রায় নেই। অনেক রকম কথা হল।

কথায় কথায় গঙ্গারাম বলল, 'ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে?'

প্রকাশক একটু ইতস্তত করে তারপর বললেন, 'ভালই। এই তো কালকেই ঢাকা থেকে আড়াই লাখ টাকার বইয়ের অর্ডার পেলাম।'

এ রকম ভাল খবর অথচ এত আমতা আমতা করে বলা দেখে গঙ্গারামকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে প্রকাশক বন্ধু ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এই দেখো, ক্যানসেলেশন অর্ডার। গতকাল অর্ডার দিয়েছিল, আজকেই সেই অর্ডার ক্যানসেল করে চিঠি দিয়েছে।'

হতবাক গঙ্গারাম আবার পথে নামল।

১১
একটি পরামর্শ

আর মাত্র দুদিন। আজ আর কাল। গতকাল তারাপদবাবুর ওখানে গঙ্গারাম অচিন লাল পাল নামে এক যুবককে নিয়ে গিয়েছিল।

পরিচয় করিয়ে দিল, 'দাদা, এ হল অচিনলাল, আমার বন্ধু, লেখেটেখে। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।'

তারাপদ রায় সাবধানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিশেষ কোনও কাম আছে?' তরুণ লেখকেরা কে যে কখন কী চায় সেটা কল্পনা করা কঠিন।

তবে অচিনলাল যা বলল সেটা তেমন কোনও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অচিনলালের একটি বই বেরিয়েছে এই বইমেলায় কিন্তু বইটি ভাল কাটতি হচ্ছে না।

তারাপদ রায় বললেন, 'কী বই?'

গঙ্গারাম বলল, 'উপন্যাস। এক কপি আপনাকে দেবে বইমেলার পরে। এখন তো সব কপি বইমেলায় আটকিয়ে আছে।'

তারাপদ রায় বললেন, 'বইয়ের কী নাম?'

অচিনলাল বলল, 'খেলব খেলা অনেক দূর।'

তারাপদ রায় প্রশংসা করলেন, 'খুব ভাল নাম।'

একটু সাহস পেয়ে অচিনলাল বলল, 'এর সঙ্গে একটা সাবটাইটেল আছে, ভাঙব শাঁখা, মুছব সিঁদুর। সম্পূর্ণ নামটা হল,

খেলব খেলা অনেক দূর।
ভাঙব শাঁখা মুছব সিঁদুর ॥'

চমকিত হয়ে তারাপদ রায় বললেন, 'তুমি কিঁ যাত্রাটাত্রা লেখ নাকি? ওই যে কী সব পালা হচ্ছে, শাশুড়ি এম এল এ বউমা জেলে, চাষির মুখে হাসি!'...

একটু লজ্জিতভাবে অচিনলাল স্বীকার করল, সে চিৎপুরের একটি যাত্রাদলের প্রম্পটার, তাই তার উপন্যাসে নাটকীয়তা বেশি। কিন্তু তাতে কোনও সুবিধে হচ্ছে না।

তারাপদ রায় একটু ভাবলেন, তারপর মাথা নেড়ে আপন মনেই বললেন, 'যাত্রায় সুবিধে হবে না, টিভি সিরিয়াল।'

গঙ্গারাম বলল, 'টিভি সিরিয়াল?'

তারাপদ বললেন, 'ঠিক তাই। ভাল করে শোনো। হাজার পঁচিশ লিফলেট ছাপতে হবে, তাতে একটা যে কোনও ঠিকানা দিয়ে লিখতে হবে,

বিখ্যাত প্রযোজক তাঁর পরবর্তী টিভি সিরিয়াল "খেলব খেলা অনেক দূর"-এর জন্যে অচিনলাল পালের খেলব খেলা অনেক দূরের নায়িকা ও নায়কের মতো প্রাণোচ্ছল যুবক-যুবতী চাইছেন।

অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।'

সুপরামর্শ পেয়ে গঙ্গারাম অচিনলাল পঁচিশ হাজার লিফলেট ছাপিয়ে আনতে চলেছে। বইমেলায় বিলি হবে। তারপর দেখা যাক, কী হয়।

১২
অদ্য শেষ রজনী

আমাদের ছোটবেলায় মফস্বল শহরে 'অদ্য শেষ রজনী' পোস্টার দিয়ে, ড্রাম বাজিয়ে দিনের পর দিন চলত একই সিনেমা। আজকাল দুর্গাপুজো, কালীপুজো এমনকী সরস্বতী পুজোয় ভাসানের পাঠ চলে পাঁচ সাত দিন ধরে।

মধ্যে কোন বছর যেন মেলা একদিন না দুদিন বাড়ানো হয়েছিল কিন্তু এখন সময়সূচি নট নড়নচড়ন, একদম পাকা। আজ বইমেলা শেষ, সমাপ্ত, The End.

সকলেরই কেমন মন খারাপ লাগছে। উৎসবের শেষে মন খারাপ হবেই। কিন্তু এ মন খারাপ তার চেয়েও কিঞ্চিৎ অধিক। ধুলো-কোলাহল ভরা এই ভূমিখণ্ডটুকু, বইয়ের গন্ধ, খাবারের গন্ধ, হাঁউ-মাউ-খাঁউ মানুষের গন্ধ, কিছু স্মৃতি, কিছু অভিমান। কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল এই এক পক্ষকালে।

পুকুর পাড়ের পাকুড় গাছটা থেকে আরও কয়েকটা পাতা হলুদ হয়ে ঝরে গেল, গাছের ডালে, জোড়াতালি নীড়ে বায়স জননী একদিন আবিষ্কার করলেন তার বাচ্চা উড়তে শিখেছে; নীল শালোয়ার কামিজ পরা শহরতলির মেয়েটি ভূগর্ভ রেলের পাতালে প্রবেশ করার মুখে একবার শেষবার তাকাল প্রায় অচেনা, ক্ষণিক বান্ধব নবীন কিশোরটির দিকে।

বইমেলা শেষ।

শীতের রেশ ফুরল। উত্তরের হাওয়া দক্ষিণ হয়ে ঘুরে আসছে।

এখন হিসেব-নিকেশ, ক্ষয়ক্ষতি। পরের বছরের জন্যে অপেক্ষা।

বইমেলা তুমি ভাল থেকো।

বইমেলা তুমি দেখো আমরা যেন ভাল থাকি। এই দীন লেখক, এই আমি, আমাকেও ভাল রেখো।

পাঁচ মিনিট

[এক]

'আপনার লেখা আর তেমন জমছে না।'

'আমার লেখা কি ফ্রিজের বরফ, নাকি ঠাণ্ডা দেশের শীতের নদী?' তারাপদ রায় বললেন, 'আমার লেখা কি যাত্রাগান, জমে যাবে?'

প্রশ্নকারিণী এ ধরনের কায়দার জবাবে তেমন অভ্যস্ত নন, তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'না। আমি ঠিক সেভাবে বলতে চাইনি। আসলে কথাটা হল, আপনার লেখা আজকাল আর তেমন জুতসই লাগে না।'

তারাপদ রায় বললেন, 'কী বলছেন, মেমসাহেব? আমার লেখা জুতসই হচ্ছে না? জানেন এই বইমেলায় আমার কমসে কম সাতটা বই বেরোচ্ছে, দু-একটা বেশিও হতে পারে।'

মেমসাহেব বললেন, 'তা বেরোক না, সাতের জায়গায় সত্তরটা বেরোক। খারাপ লেখা বেশি লিখে লাভ কী?

তারাপদ রায় বললেন, 'এ আর বেশি কী?'

মেমসাহেব অবাক, 'বেশি নয়?'

তারাপদ রায় বললেন, 'বেশি আর কী? সব তো নতুন বই নয়। এখন তো গড়াপেটার যুগ চলছে, অনেক বইই গড়াপেটা।'

পাঠিকা বললেন, 'মানে?'

তারাপদ বললেন, 'প্রিয় রচনা, বাছাই গল্প, শ্রেষ্ঠ কবিতা—এই রকম সব আর কী।'

পাঠিকাও পিছুপা নন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন, 'সরস, সরসতর, সরসতম, নীরস, নীরসতর, নীরসতম। এক ডজন, আরেক ডজন, আরো এক ডজন।'

তারাপদ রায় সরলভাবে বললেন, 'আপনার ভাল লাগে না?'

মেম বললেন, 'কী আর ভাল লাগবে? সবই যে সেই একই গল্প।'

তারাপদ রায় বললেন, 'সব একই গল্প?'

মেম বললেন, 'একই কিংবা একই রকম।'

তারাপদ রায় বললেন, 'ঠিক আছে আপনাকে একটা জমাটি রসিকতা বলছি, একেবারে আনকোরা নতুন।

এক তরুণী জ্যোতিষীর কাছে গেছেন, জ্যোতিষ ঠাকুর, আমাকে বলে দিন, ঠিক কী রকম স্বামী আমার উপযুক্ত হবে। জ্যোতিষী বললেন, স্বামীদের ছেড়ে দিন। আপনি বরং কোনও ব্যাচেলরকে বিয়ে করুন।'

মেম এবারে ভ্রূ কুঞ্চন করলেন, বললেন, 'হল না, হল না।'

অবশেষে তারাপদ রায় বললেন, 'আপনি তো রীতিমতো বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালেন দেখছি।'

জিজ্ঞাসু রমণী বললেন, 'তার আর কী করা যাবে? লেখা জমাটি করতে না পারলে আপনাকে বিরক্ত করতেই হবে।'

তারাপদ বললেন, 'একটা জমাটি গল্প বলতে পারি, লজ্জা পাবেন না তো?'

মেম বললেন, 'লজ্জা?'

তারাপদ বললেন, 'ও, আপনার লজ্জা নেই! তা হলে শুনুন—

একদিন গঙ্গারামকে দার্শনিক উপদেশ দিচ্ছিলাম, তোমার স্বপ্নকে কখনও কাছছাড়া করবে না, সব সময় জড়িয়ে থাকবে।

গঙ্গারাম বলল, দাদা আমি তো তাই চাই। কিন্তু সে তো কাছে বসতেই দেবে না, জড়িয়ে ধরতে গেলে আঁচড়ে-কামড়ে দেবে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, এ তো স্বপ্ন নয়, তোমার এই সে, সে আবার কে?

গঙ্গারাম মুখ নিচু করে স্বভাব-অনুচিত লজ্জিত কণ্ঠে বলল, দাদা, সে আপনার বউমা।'

[দুই]

'আপনাকে নিয়েই যদি লিখতে হয় মেমসাহেব আপনার নামটা তো আমাকে বলতে হবে। বলব না? কখনওই না?'

'ঠিক আছে আপনার আসল নামটা না হয় উহ্য থাক। কিন্তু আগে বলুন তো নাম প্রকাশে আপনার দ্বিধা কোথায়?'

'সেটা বলবেন না। মনে হচ্ছে, তারাপদ রায়ের সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ্যে জড়াতে চাইছেন না। তা আপনাকে না হয় সুভাষিণী নামেই উল্লেখ করছি। আপত্তির কী আছে, সত্যিই তো আপনি সুভাষিণী, সুন্দর কথা বলেন।'

সুভাষিণী ঝংকার দিয়ে উঠলেন, 'আদিখ্যেতা রাখুন। নতুন কিছু থাকে তো বলুন। বেশি বাড়াবেন না, ছোট করে বলুন। আমার তাড়া আছে। আমাকে বাড়ি ফিরে কাটলেট ভাজতে হবে।'

'কাটলেট?' তারাপদ রায়ের লোভী চোখ দুটি ঝকঝক করে উঠল, জিবে জল এল—'কাটলেট কার জন্যে?'

সুভাষিণী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার ঘরোয়া ব্যাপারে এত কৌতূহল কেন?'

তারাপদবাবু বললেন, 'অনেকদিন ভাল কাটলেট খাইনি। খাওয়ার চেষ্টা যে করিনি তা নয়।'

'কাটলেট খাওয়ার চেষ্টা? সে আবার কী?'

তারাপদ রায় বললেন, 'পর পর তিনটে ঘটনার কথা বলছি। শুনলে বুঝতে পারবেন।'

'তার মানে আবার বাজে গল্প। তা বলুন।' সুভাষিণী অনুমতি দিলেন।

তারাপদ রায়ের যা স্বভাব, সবচেয়ে বাজে গল্পটাই আগে বললেন।

'সেদিন একটা পুরনো দিনের নামকরা রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম। এককালে এই

দোকানের কাটলেট বিখ্যাত ছিল। বহুকাল পরে ওই দোকানে গেলাম। মন খারাপ হয়ে গেল। কেমন ভাঙাচোরা, প্রায়ান্ধকার। সে যা হোক, একটা নড়বড়ে টেবিলের একপাশে অধিকতর নড়বড়ে চেয়ারে বসে একটা কাটলেটের অর্ডার দিলাম। এক ঘণ্টা পরে চটাওঠা হলদে ছোপলাগা একটা প্লেটে একটা কাটলেট আমার সামনে এসে পৌঁছোল। সেই কাটলেটটা অতি প্রাচীন মরচে ধরা ছুরি-কাঁটা দিয়ে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই কাটলেটটা কাটতে পারলাম না। সেটা ছুরির চাপে ব্যাঁকা হয়ে গেল, কিন্তু কাটা গেল না। বেয়ারাকে ডেকে বললাম, এ কাটলেটটা খাওয়া যাবে না, ফেরত নিয়ে যাও। বেয়ারা বললে, কাটলেটটা আপনি বেঁকিয়ে ফেলেছেন, এটা ফেরত হবে না।'

তারাপদ রায়ের এই গল্প শুনে সুভাষিণী হাততালি দিয়ে উঠলেন। তারাপদ বললেন, 'হাততালি কেন?' সুভাষিণী বললেন, 'আজ এই গল্পের সুবর্ণজয়ন্তী হল। তা আপনার অন্য গল্প শুনি।'

একটু মলিনভাবে তারাপদ রায় বললেন, 'পরের গল্পটা কিন্তু সত্যি।'

সুভাষিণী বললেন, 'সত্যি? কিন্তু পুরনো গল্প নয় তো।'

বিরক্ত হয়ে তারাপদ বললেন, 'নতুন-পুরনোর ব্যাপার নয়। এক লাইনে গল্পটা বলি। ওখান থেকে বেরিয়ে অন্য একটা রেস্তোরাঁয় কাটলেট নিয়ে ছুরি-কাঁটা দিয়ে কাটতে গিয়ে ঝুরঝুর করে ভেঙে গেল, একেবারে ভাজা সুজির দানা, কাটলেটের পরিণতি দেখে বেয়ারাকে বললাম, এই কাটলেট কে খাবে? ম্যানেজারকে ডাকো। বেয়ারা বলল, স্যার এ কাটলেট ম্যানেজার সাহেবও খেতে পারেন না।'

তৃতীয় গল্পটি বলতে যাচ্ছিলাম, সুভাষিণী হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আর গল্প লাগবে না। আপনাকে আমি চারটে কাটলেট বিকেলে পাঠিয়ে দেব।'

[তিন]

তারাপদ রায় ভেবেছিলেন এই যৎসামান্য পাঁচ মিনিটে গঙ্গারামের মতো গোলমেলে ব্যক্তিকে টেনে আনবেন না।

কিন্তু তাঁর কী সাধ্যি যে মহামহিম গঙ্গারামকে ঠেকাবেন।

পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা আপনমনে গজগজ করতে করতে গঙ্গারাম এসে হাজির। পরপর দুকাপ চা গলাধঃকরণ করেও তার গজগজানি যায় না।

বাধ্য হয়ে তারাপদবাবু জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার? এত রাগের কী হয়েছে?'

গঙ্গারাম বলল, 'রাগের আর কী দোষ? আচ্ছা, বলুন তো ওই সুভাষিণী না কুভাষিণী মহিলাকে কী করে জোটালেন? আপনি ওর মধ্যে কী পেলেন?'

ব্যাপারটা পুরোপুরি হিংসার ব্যাপার সেটা বুঝতে পেরে তারাপদ একটু মুচকি হাসতেই গঙ্গারাম আরও রেগে গিয়ে বললে, 'আপনার লজ্জাও করে না। ছি! ছি! এই বুড়ো বয়েসে।'

তারাপদবাবুর একটু রাগ হল। বললেন, 'বুড়ো বয়েসে কী করেছি? এক গুণমুগ্ধ পাঠিকার তৈরি গোটাকয়েক কাটলেট খেয়েছি। তাতেই ছি-ছি হয়ে গেল!'

—গুণমুগ্ধা? না ছাই? গঙ্গারাম মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'মহিলা তো আপনাকে চোরাই মালের কারবারি বলে। বলে, পুরনো মালের আড়তদার!'

—তুমিও তো তাই বল। নিঃশব্দে গঙ্গারামের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগলেন তারাপদবাবু।

গঙ্গারাম যথাসাধ্য নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু সেই একটা কথা আছে না, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়! সহসা একটা প্লেট আরেকটা প্লেট দিয়ে ঢাকা দিয়ে সুভাষিণী এই ঘরে ঢুকলেন। দুই প্লেটের অন্তর্নিহিত সুখাদ্যের সুগন্ধে ছোট ঘর আমোদিত হয়ে উঠল।

তারাপদ রায় বললেন, 'কী শিককাবাব নাকি?'

সুভাষিণী উত্তর দেয়ার আগেই গঙ্গারাম দুই প্লেটের মধ্যবর্তী ফাঁকে অবলোকন করে বলল, 'মনে হচ্ছে রেশমি কাবাব।'

সুভাষিনী এই প্রথম গঙ্গারামকে দেখলেন। কিন্তু তাঁর চিনতে অসুবিধে হল না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই গঙ্গারাম?'

গঙ্গারাম যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে। সে গদগদ হয়ে বলল, 'আমি রেশমি কাবাব ভালবাসি। আমি যখন...।' সুভাষিণী তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আপনিও একটা পাবেন।'

গঙ্গারাম তারাপদবাবুর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, 'তার বিনিময়ে আমি প্রতারণা করব না। রদ্দি, পচা, বাসি মাল গছাব না। এই নিন একটা টাটকা-টাটকা—

চিড়িয়াখানায় পাশের অচেনা মহিলাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বলতে পারেন, এই সামনের খাঁচার গণ্ডারটা মেয়ে-গণ্ডার না পুরুষ-গণ্ডার?

মহিলা কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কী গণ্ডার?

আমি বললাম, আমি গণ্ডার হব কেন?

মহিলা বললেন, দেখুন, একজন গণ্ডার ছাড়া আর কারও কৌতূহল থাকা উচিত নয় এ ব্যাপারে।'

তারাপদবাবুকে বিস্মিত করে সুভাষিণী এই গল্প শুনে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

[চার]

'ওকী আপনি একা একা বসে আছেন? সুভাষিণী বউদি কোথায়?'

হাঁপাতে হাঁপাতে গঙ্গারাম এক চাঙারি হিংয়ের কচুরি এবং এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করল।

বুঝলাম মোড়ের ভারতমাতা সুইটস থেকে সদ্য ভাজা কচুরি, গঙ্গারাম কিনে এনেছে, হিংয়ের লোভনীয় গন্ধে আমার ঘর আমোদিত।

কিন্তু হিংয়ের কচুরির লোভ সম্বরণ করলাম। আর তা ছাড়া এ কচুরি তো আমার জন্যে নয়। এ তো সুভাষিণীর জন্যে। আমার আরও বেশি রাগ হল এই কারণে যে গঙ্গারাম আমার বাড়িতে এসে সুভাষিণীর খোঁজ করছে।

বুঝতে পারছি গঙ্গারামের সঙ্গে সুভাষিণীর খুবই হৃদ্যতা হয়েছে। গঙ্গা চিরকালই এইরকম, যখন যার ওপরে ঝোঁকে একেবারেই ঝুঁকে পড়ে।

কিন্তু সুভাষিণী বিবাহিতা মহিলা, তার হাবাগোবা না হলেও ভালমানুষ গোছের জলজ্যান্ত স্বামী আছে। গঙ্গারামেরও গৃহে যুবতী পত্নী। আর আমার স্ত্রী-রত্ন তো সুপরিচিতা।

আমি গঙ্গারামকে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতার কথা বললাম, কিন্তু সে সুভাষিণী নেই দেখে কচুরিগুলো দোকানে ফেরত দিতে যাচ্ছিল। আমি তাকে বাধা দিলাম, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে; দোকানদার ও কচুরি ফেরত নেবে না। কোনওদিন ফেরত নিতে দেখিনি।'

গঙ্গারাম কিঞ্চিৎ নিরস্ত হল। আমাকে একটিও না দিয়ে আমার চোখের সামনে বসে একটির পর একটি কচুরি খেতে লাগল, একবার গলায় আটকিয়ে যাওয়ায় বলল, 'একটু চা হলে ভাল হত।' তারপর উঠে বাড়ির মধ্যে গিয়ে চায়ের কথা বলে এল।

একটু পরে চা এল। চায়ের সঙ্গে মিনতি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হইহল্লা কীসের?'

গঙ্গারাম বলল, 'দেখুন বউদি, দাদা আমাকে পরস্ত্রীর বিষয়ে জ্ঞান দিচ্ছিলেন।'

আমি বললাম, 'কোনও জ্ঞান দিইনি তবে সাবধান করছিলাম।'

গঙ্গারাম জ্বলে উঠল, 'আপনি সাবধান করার কে? আপনিই না বউদিকে বলেছিলেন, তোমাকে একদম পরস্ত্রীর মতো দেখাচ্ছে!'

আমি বললাম, 'না বলিনি, বলার সুযোগ খুব একটা পাইনি।'

মিনতি বললেন, 'সাহসও হয়নি।'

গঙ্গারাম আমাকে বলল, 'কিন্তু লিখেছেন তো? এই তো সেদিনও এই কথা লিখেছেন।'

আমি বললাম, 'কত কথাই তো লিখি, লিখতে হয়। আমার কথা বাদ দাও, তোমার কথা বলো। সুভাষিণীর সঙ্গে তোমার এত মাখামাখির চেষ্টা কেন?'

সুভাষিণীর কথা চলে আসায় গঙ্গারাম একটু নরম হল, 'দাদা, সুভাষিণী নাম তো আপনার দেয়া। ওর আসল নাম কী?'

মিনতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী? নামটা জানার চেষ্টা করনি?'

গঙ্গারাম বলল, 'আমি একটু ঘুরিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। সেদিন আপনার এখান থেকে বেরোনোর পথে সুভাষিণীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ফোন নম্বর কত? সে বলল, টেলিফোন ডিরেক্টরিতে পাবেন। তখন বললাম, কিন্তু আপনার নামটা? এবারে সে বলল, ওই টেলিফোন ডিরেক্টরিতেই আছে।'

তাকিয়ে দেখি, মিনতি মুখ টিপে হাসছেন।

[পাঁচ]

'একেবারে হ-য-ব-র-ল করে ফেললেন যে মশায়!' আজ ঘরে ঢুকেই সুভাষিণী চার্জ করলেন।

একটু গুটিয়ে গিয়ে তারাপদ রায় রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে বললেন, 'হ-য-ব-র-ল কী করলাম? 'হ-য-ব-র-ল না তো কী?' তিনি বললেন, 'ছিল বেড়াল হয়ে গেল চশমা। ছিল তারাপদ রায়ের জন্যে, হয়ে গেল পাঁচ মিনিট।'

আক্রমণের কারণটা বুঝতে পেরে সুভাষিণীর মুখের কথাটা লুফে নিয়ে তারাপদ রায়

বললেন, 'তার মানে, তারাপদ রায়ের পাঁচ মিনিট, ভালই হয়েছে, দুইয়ে মিলে প্রায় একই ব্যাপার হল।'

'একই ব্যাপার?' ভ্রুকুঞ্চন করলেন শ্রীমতী।

এই সময়ে তারাপদ রায় কথার মোড় একটু ঘোরানোর চেষ্টা করলেন, 'সেদিনের কাটলেটগুলো কিন্তু খুব ভাল ছিল।'

সুভাষিণী বললেন, 'খুব খুশি হলাম আপনার সার্টিফিকেট পেয়ে। সেদিন কাটলেট পাঠিয়েছিলাম তিনটে, আপনি কাটলেট নিয়ে তিনটে গল্প বলেছিলেন ভেবে, কিন্তু পাঠানোর পরে মনে পড়ল গল্প তো তিনটে ছিল না।' 'তিনটে ছিল না?' প্রশ্ন করলেন তারাপদ রায়।

সুভাষিণী বললেন, 'তিন নম্বর গল্পটা আপনি বলবার আগেই তো আমি কাটলেট বানাতে চলে গেলাম।'

একটু চেষ্টা করতেই তৃতীয় গল্পটা মনে পড়ল তারাপদবাবুর। না পড়লেও পারত, কারণ এ রকম কত গল্পই যে তাঁর মাথার মধ্যে গিজগিজ করে, ভেসে ওঠে আর ডুবে যায়!

কিন্তু এই তৃতীয় কাহিনীটি ঠিক গল্প নয়, একটি নির্মম ঘটনা। তাই তারাপদবাবু ভোলেননি।

চৌরঙ্গি এলাকার একটা রেস্তোরাঁয় তারাপদবাবু একদিন একটা কাটলেট খেয়েছিলেন। অসামান্য ছিল সেই কাটলেটটি। তার স্বাদ জিবে লেগে ছিল।

তিনদিন বাদে সেই কাটলেটের লোভে তারাপদবাবু আবার সেই রেস্তোরাঁয় গেছেন। কিন্তু অর্ডার দেওয়ার পর প্লেট থেকে এক টুকরো কাটলেট মুখে ফেলে দেখেন, অখাদ্য, তিতকুটে, পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। তারাপদবাবু দোকানের বেয়ারাকে বললেন, 'এ কী কাটলেট দিয়েছ? তিনদিন আগে তোমাদের দোকানের কাটলেট খেয়েছি, কী চমৎকার, আর আজকে এই পচা জিনিস দিয়েছ!'

বেয়ারা হাত কচলিয়ে বলল, 'সেই তিনদিন আগের কাটলেটই তো দিয়েছি স্যার।'

গল্পটা শেষ করে খুব আশা নিয়ে সুভাষিণীর দিকে তাকালেন তারাপদ রায়।

কিন্তু বাড়া ভাতে ছাই ছিটোনোর মতো মুখভঙ্গি করে সুভাষিণী বললেন, 'এ গল্পটা আপনার ওই কাটলেটটার চেয়েও পচা।'

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি

লেখকের নাম :
বইয়ের নাম :
ভুক্তি নম্বর : মূল্য :
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

বই ফেরতের নির্ধারিত তারিখ	সদস্য নম্বর	সদস্যের স্বাক্ষর	ফেরত গ্রহণকারীর স্বাক্ষর
২৮/৫	-৭৮৪৩		

.... আ লো কি ত মা নু ষ চাই ....

তারাপদ রায়ের জন্ম নভেম্বর ১৯৩৬, বাংলাদেশের টাঙাইলে। শিক্ষা : প্রথমে বাংলাদেশে, পরে ১৯৫১ সালে কলকাতায় কলেজে পড়তে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন, তারপর সরকারি চাকরি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার

প্রচ্ছদ দেবাশীষ দেব

পৃথিবী জুড়ে নানা সংকট ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও মানুষ তার নিত্যদিনের জীবনে একটু হাসতে চায়, পেতে চায় সামান্য রম্যতার স্পর্শ। সেই ধারাতেই 'বালিশ' নবতম সংযোজন। বারংবার পড়ার মতো, মনে রাখার মতো এবং অন্যকে বলার মতো এক অনবদ্য রম্যসংগ্রহ।